স্কুলের মেয়েরা

স্কুলের মেয়েরা

পরিমল গোস্বামী

গ্র ন্থ ম্
২২।১, কর্নোয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ
ফাল্গুন, ১৩৬৪

*

প্রকাশক
প্রকাশচন্দ্র সাহা
গ্রন্থম্
২২।১, কর্নোয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

*

একমাত্র পরিবেশক
পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিঃ
পত্রিকা হাউস
কলিকাতা-৩

*

মুদ্রক
রঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

*

চিত্র ও প্রচ্ছদ
কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার
বিভূতি সেনগুপ্ত

মূল্য : দু'টাকা

স্কুলের মেয়ে

শ্রীমতী কৃষ্ণাকে দিলাম

জ্যাঠামশাই

রচনাকাল ১৯৪৪

স্কুলের মেয়েরা

চপলা মেয়েটি মহেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণী আলো ক'রে থাকে।

শুধু আলো নয়, তেজও আছে। রূপ তার কিছু আছে, কিন্তু তার উপর রঙের প্রলেপ প'ড়ে তাকে আরও উজ্জ্বল করে। যখন সে মুখে স্নো মেখে তার উপর পাউডার লাগিয়ে গালে রুজের আভা ফুটিয়ে, ঠোঁট দুটি লিপস্টিকের স্পর্শে রাঙা ক'রে তোলে, আর সেই সঙ্গে দামী সিল্কের রঙীন শাড়ী আর ব্লাউজে দেহটাকে বিশেষ ভঙ্গিতে সাজিয়ে হাতে অভিনব ডিজাইনের চুড়ি, গলায় হার আর কানে তিন ইঞ্চি লম্বা দুল প'রে, হাই হীল জুতোয় সগর্বে গাড়ি থেকে নেমে ক্লাসে এসে ঢোকে, তখন ক্লাসের মেয়েরা বিস্মিত অভিভূত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে।

অনেক মেয়েরই সঙ্কোচ হয় তার কাছে এগিয়ে এসে কথা বলতে। চপলা তাদের সাদাসিদে পোশাককে লজ্জা দিতে থাকে। মনে হয়, যেন সে তাদের ঐ কম দামের পোশাকের জন্যই তাদের ঘৃণা করছে।

কেউ কেউ চপলার সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টাও করেছে, কিন্তু দু'দিনেই হার মেনে গেছে। কারণ চপলা মাসে দু'

তিনবার ক'রে তার পোশাক আর গহনার ভঙ্গি বদলে ফেলে। মাসের গোড়ায় যা পরে, দিন দশেক পরে দেখা যায় গহনা সবই নতুন। লম্বা দুলের জায়গায় নতুন ডিজাইনের কানপাশা। আবার ক'দিন পরে দেখা যায় মেম-সাহেবদের মতো অতি সাধারণ একটি ক'রে রিং কানে দুলছে। আরও ক'দিন পরে হীরে-বসানো ফুল। কখনও প্রকাণ্ড পাথরের একটি ক'রে বল। হাতে কখনো সরু চুড়ি, কখনো চওড়া ব্রেসলেট, কখনো খালি হাতে শুধু একটি ছোট্ট ঘড়ি। এর উপর আবার খোঁপার রকমারি গড়ন, আর শাড়ীর বাহার তো আছেই।

চপলা রোজ একই জায়গায় এসে বসে। যারা তার পাশে বসার সৌভাগ্যলাভ করেছে, তাদের দারিদ্র্যের সঙ্কোচ অনেকটা কেটে গেছে, তারা এখন মনে মনে গর্বিত। যেন চপলা তাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে তাদের মলিনতার উপরে একটা পালিশ লাগিয়ে দিয়েছে। তারা স্কুলে এসে কয়েক ঘণ্টার জন্য এই তৃপ্তিটুকু পায়, ধন্য হয়ে যায় তারা। স্কুলের ছুটি হলে প্রকাণ্ড গাড়ি আসে চপলাকে নিতে। এই কাছে-বসা মেয়েরা তার গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে তাকে বিদায় দেয়। তখন তারা যে অন্য মেয়েদের মনে ঈর্ষা জাগিয়ে তুলছে তাই ভেবে একটা গর্ব বোধ করে। তারা চপলার কত আপনার, অন্য মেয়েরা তাদের থেকে কত দূরে।

কিন্তু এই গর্ব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। চপলার গাড়ি

চ'লে গেলে তারা যেন নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। অন্যান্য মেয়েদের মতোই তাদের হেঁটে বাড়ি ফিরতে হয়। পথের আবর্জনা এড়িয়ে, লোকের ধাক্কা এড়িয়ে, গাড়ি ঘোড়ার জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে, বহু সঙ্কোচে, বহু দুঃখ সয়ে, বই খাতা হাতে, হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরা। শুধু তাই নয়, চপলার পাশে ব'সে তাদের যে দাম, চপলার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে তাদের যেন আর সে দাম থাকে না। তখন প্রকাণ্ড শহরের প্রকাণ্ড পথে তারা সম্পূর্ণ পরিচয়হীন। হাজার হাজার লোকের মাঝখানে কে তাদের চেনে ?

তারপর যতই বাড়ির কাছে আসতে থাকে, ততই মনটা খারাপ হয়ে আসে, বাড়িতে পোঁছে মনে আর কোনো আনন্দই অবশিষ্ট থাকে না।

এইভাবে চপলার পাশে বসার ভাগ্য যারা লাভ করেছে মাধুরী তাদের মধ্যে একজন। ক্লাসে প্রতিদিন সে চপলার ডান দিকে বসে। বাঁ দিকে বসে উমা, উমার পাশে বসে কনক এবং কনকের পাশে বসে রেবা। অন্য দিকে মাধুরীর পাশে বসে সাবিত্রী, সাবিত্রীর পাশে বসে মলিনা। ওদের পিছনে যারা বসে তারা পিছনেরই মেয়ে, সম্পর্ক তাদের সঙ্গে বিশেষ কিছুই নেই। তবু কাছাকাছি ব'সে যেটুকু সুখী হয়। পিছনের দু'তিনটি মেয়ে মাঝে মাঝে ওদের কথায় যোগ দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু তবু দূরত্বটা থেকে যায়।

স্কুলের অন্য দু'চারজন মেয়ে বাড়ির গাড়িতে যে আসে

না তা নয়, কিন্তু তাদের গাড়ি চপলার গাড়ির মতো অমন বড়ও নয়, অত দামীও নয়। চপলা তাদের প্রতি যেন একটু বেশি অপ্রসন্ন। তার মনের ভাবখানা যেন এই যে ঐ গাড়িতে-আসা মেয়েরা যেন তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে চায়। কেন রে বাপু, গাড়িতেই যদি চড়বি তবে ও রকম শস্তা গাড়িতে কেন, আর যদি দামী গাড়ি কিনতে না পারিস তবে গাড়িতে ওঠার শখ কেন ? চপলা ওটা তাদের একটা স্পর্ধা ব'লেই ধ'রে নেয়।

চপলা মাত্র তিনমাস হ'ল মহেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এতদিন সে বাড়িতেই পড়ত, কিন্তু তার বাবা তাকে স্কুলে পড়াবেন ব'লে ঠিক করলেন। বাইরের মেয়েদেব সঙ্গে একটুখানি মেলামেশা না করলে সামাজিকতা শিক্ষা হয় না, এইটে তাঁর এক বন্ধু বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

চপলার বাবার নাম মৃত্যুঞ্জয় মিত্র, ব্যবসায়ী লোক, অনেক দিনের বড় ব্যবসা, যুদ্ধের বাজারে আরও ফেঁপে উঠেছেন। লোকটি কিন্তু ভাল, বন্ধুবান্ধবদের যথাসাধ্য উপকার ক'রে থাকেন, এবং ধরলে টাকা ধার দিয়েও অনেককে সাহায্য করেন। তাঁর নিজের কোনো অহঙ্কার নেই। তাঁর একটি মাত্র মেয়ে ওই চপলা, এবং তাকে লেখাপড়া শেখাবেন, এ ইচ্ছা বরাবরই আছে। কিন্তু লেখাপড়া শেখানোর ভার বাবা নিলেও, বিলাসিতা শেখানোর ভার নিয়েছিলেন তার মা।

একদিন কোন্ এক প্রতিবেশীর একটা কথা চপলার মায়ের কানে এসেছিল। কে নাকি বলেছে টাকা থাকলে কি হয়, ওই কালো মেয়ের সহজে বিয়ে হবে না।

চপলাকে ঠিক কালো বলা যায় না, কিন্তু ঈর্ষার চোখে দেখলে সুন্দরী মেয়েরও কালো হতে আর কতক্ষণ লাগে। শোনা কথাটা চপলার মা চপলার সামনেই বলেছিলেন; বলেছিলেন সেজন্য তাদের ভাবতে হবে না, টাকা দিয়ে রাজপুত্তুর কেনা যায়, বিয়ের সময় তারা যেন দেখে।

কথাটা চপলার ভালই লেগেছিল, কিন্তু তবু সে যে কালো এমন কথা আগে শোনে নি, তাই তার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

এর পর থেকে চপলার মা তাকে সুন্দরী বানানোর জন্য উঠে প'ড়ে লাগলেন এবং তাঁরই ব্যবস্থা মতো এক জাপানী স্ত্রীলোক নিযুক্ত হ'ল নতুন নতুন ফ্যাশানের খোঁপা বেঁধে দেবার জন্য। এই জাপানী স্ত্রীলোকের কেশসজ্জার একটা দোকান ছিল।

অন্যদিকে গহনা আর শাড়ীর ব্যবস্থাও হ'ল হাল ফ্যাশানের। চপলার সৌন্দর্যও দিনে দিনে চমকপ্রদ হতে লাগল। আর ঠিক এই সময়েই মৃত্যুঞ্জয়ের খেয়াল হ'ল মেয়েকে স্কুলে দেবেন।

সামাজিকতা একটা মস্ত বিদ্যা, বড় ঘরে বিয়ে হ'লে এই বিদ্যার জন্যও মেয়ের মান বাড়বে। মায়ের রুচিতে সাজানো

এক জাপানী স্ত্রীলোক নিযুক্ত হ'ল নতুন নতুন ফ্যাশানের খোঁপা বেঁধে দেবার জন্য। (পৃ. ৫)

মেয়ে বাপের ইচ্ছায় স্কুলে ভর্তি হ'ল। মায়েরও মনে একটা পুলক খেলে গেল, এই উপলক্ষে তাঁর মেয়ের সাজসজ্জা আর সৌন্দর্যের কথা সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে।

মৃত্যুঞ্জয়ের ইচ্ছা ছিল মেয়েকে মেম-সাহেবদের স্কুলে দেবেন, কিন্তু মায়ের তাতে মত হ'ল না। ইংরেজী স্কুলে গেলে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, তাই বাঙালী-পাড়ার স্কুলেই দিতে হ'ল। বড় কোনো স্কুলে জায়গা না হওয়ায় অগত্যা মহেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয় নামক অখ্যাত এক স্কুলে ভর্তি ক'রে দিতে হ'ল। অখ্যাত হ'লেও শহরে অসম্ভব লোকবৃদ্ধির জন্য এখানেও প্রায় চার শ মেয়ে পড়ে। এর আগে এ স্কুলে মেয়ে জোটানোই দায় ছিল।

চপলার আবির্ভাবে স্কুলে এক মহা রহস্যপূর্ণ উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল মেয়েদের মধ্যে।

দুই

এর মধ্যে কতদিন কেটে গেছে, চপলা তার ক্লাসের প্রথম সারিতে মধ্যবর্তী আসনে ক্লাসের মধ্যমণি হয়ে বসেছে।

প্রথম ঘণ্টায় ইংরেজীর ক্লাস আরম্ভ হ'ল। হেড মিস্ট্রেস বীণা বসু বি. এ., বি. টি. বই প'ড়ে মানে বুঝিয়ে দিচ্ছেন এবং মাঝে মাঝে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন। চপলার সেদিকে কোনো খেয়াল আছে কিনা বোঝা যায় না। সে দেখছে

বীণাদি আজ নতুন একখানা শাড়ী প'রে এসেছেন, এই শাড়ী তাঁকে চমৎকার মানিয়েছে। কিন্তু এ কি শাড়ী? এ রকম তো চপলা আগে দেখে নি।

কিছুই না, সাধারণ সিল্কের শাড়ীর উপর নিজ হাতে চমৎকার নক্সার কাজ করা, অতএব চপলার চোখে তা অভিনব মনে হওয়া আশ্চর্য নয়।

চপলার মন উধাও হয়ে গেছে অন্য জগতে। তার মনে শুধু প্রশ্ন এ কোথাকার শাড়ী। কিন্তু প্রকাশ্যে তো সে কথা বলা যায় না, তাই একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগল।

বীণা বসুর বয়স হবে প্রায় ছাব্বিশ। এখনও বিয়ে হয়নি। কিন্তু তাঁর পোশাকের পারিপাট্য দেখে সবাই বলাবলি করে। মুখে রং মাখাও বাদ নেই।

মেয়েদের অনেক মীটিং বসেছে এ নিয়ে অনেক দিন। এখন আর এ নিয়ে ওরা আলোচনা করে না, এক রকম সয়ে গেছে ব্যাপারটা। কিন্তু চপলা নতুন এসেছে। তার উপর পোশাক বিষয়ে সবার চেয়ে সচেতন বেশি; তা ছাড়া, আর কেউ তাকে এ বিষয়ে ছাড়িয়ে যাবে এটা তার পছন্দ নয়।

পড়ার কথা ভুলে চপলা হেড মিস্ট্রেসের শাড়ীর কথাই ভাবছে আর মনে মনে অস্থির হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যে তার যে প্রশ্নের উত্তর দেবার পালা এসে গেছে তা তার খেয়াল নেই। তাই বীণাদি যখন তার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন,

"দি হিল্‌স্‌ আর সেপারেটেড বাই এ রিভার" মানে কি, তখন চপলা চমকে উঠল।

তার মন তখন ঈর্ষায় জ্বলছিল। প্রশ্নটা এলো যেন তার প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে একটা তীরের মতো, এসে তার বুকে বিঁধল। প্রশ্নের কথাগুলো তার কানে যায় নি, কিন্তু প্রশ্ন তাকে কেন করা হ'ল হঠাৎ তা কিন্তু সে চট ক'রে বুঝে ফেলল, তার ধারণা হ'ল তাকে জব্দ করার জন্যই এই কৌশল।

চপলা সোজা দাঁড়িয়ে উঠে বেশ একটু মেজাজ দেখিয়েই বলল, "ওর মানে আমি জানি না।"

জানি না ব'লে এত অহঙ্কার ইতিপূর্বে সে আর দেখায় নি। সবাই অবাক হ'ল তার কথা শুনে, সবাই হাঁ ক'রে চেয়ে রইল তার দিকে, তার এ ব্যবহার তার ভক্তদেরও হজম করতে একটু কষ্ট হ'ল। হেড মিস্ট্রেস কিন্তু সহজ ভাবেই বললেন, "জান না কেন? ক্লাস নাইন-এ প'ড়ে এই সহজ কথাটির মানে না জানা কিন্তু অন্যায়। তা ভিন্ন কোনো কিছু না জানলে একটু লজ্জা পাওয়া উচিত, তাই নয় কি?" ব'লে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

চপলার তখন মাথা বন বন ক'রে ঘুরছে। তার মনে আর সন্দেহ নেই যে বীণাদি সবার সামনে তাকে জব্দ করবেন ব'লেই পণ করেছেন। তার ইচ্ছা হচ্ছিল তখুনি হাত বাড়িয়ে তাঁর শাড়ীখানা ছিঁড়ে তাঁকে আঁচড়ে কামড়ে এর প্রতিশোধ নেয়, কিন্তু উপায় নেই। ইচ্ছা হচ্ছিল, বলে,

চপলা সোজা দাঁড়িয়ে উঠে বেশ একটু মেজাজ দেখিয়েই বলল,
"ওর মানে আমি জানি না।" (পৃ. ৯)

তার কিছু জানার দরকার নেই, তার বাবার লাখ লাখ টাকা আছে, সে যে স্কুলে এসেছে তাই তার পক্ষে যথেষ্ট, সে বীণাদির মতো দশটা টীচার মাইনে ক'রে বাড়িতে পুষতে পারে। কিন্তু কিছুই সে বলতে পারল না। অতি উচ্ছ্বাসে সে কেঁদে ফেলল এবং দু'হাতে মুখ ঢেকে মাথা নিচু ক'রে ব'সে রইল।

বীণাদি আর কিছু না ব'লে স্বাভাবিক ভাবে পড়িয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু পড়ানো তেমন জমল না। মাধুরী, সাবিত্রী, মলিনা, উমা, কনক—এদের মনের মধ্যেও একটা তোলপাড় হয়ে গেছে। তারা শুধু অপেক্ষা করছে কখন ক্লাস শেষ হবে আর চপলার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে তার আরও অন্তরঙ্গ বন্ধু হতে পারবে।

ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টা বাজল, বীণাদি চ'লে গেলেন।

চপলা পাশের বন্ধুদের বলল, "এই ছোটলোকদের স্কুলে পড়ছি ব'লেই না আজ এত অপমান সহ্য করতে হ'ল।"

কনক বলল, "তোমার কি ভাই এখানে পড়া সাজে? এখানে ওই রকমই সব। সবাই স্বার্থপর। মিস্ দত্ত আছেন একজন, তাঁর ক্লাসে আমরা সবাই গাল খাই, কিন্তু (গলাটা একটু খাটো ক'রে) কিন্তু ওই যে বেলা মেয়েটা ব'সে আছে ওই কোণে, পড়াশোনা কিছুই করে না, কিন্তু ওকে একদিনও বকুনি খেতে দেখি নি।"

চপলা জিজ্ঞাসা করল, "কেন?"

পাশ থেকে সাবিত্রী ব'লে উঠল, "কেন তা জান না বুঝি ? মিস্ দত্ত ওকে প্রাইভেট পড়ান।"

চপলা বলল, "ও ! তা হ'লে আমি যদি বীণাদির কাছে প্রাইভেট পড়ি তা হ'লে উনি আমাকে খাতির করবেন ?"

সাবিত্রী বলল, "না, সে হবার জো নেই। উনি হেড মিস্ট্রেস কিনা, প্রাইভেট পড়ালে ওঁর সম্মান থাকে না! তাই উনি প্রাইভেট পড়ান না।"

মলিনা মাথাটা একটু কাছে এনে বলল, "শুনেছি গোপনে গোপনে পড়ান।"

এ কথাটা কিন্তু সে সম্পূর্ণ কল্পনা ক'রে বলল আসর জমানোর জন্য।

উমার একটু রসবোধ ছিল, সে বলল, "প্রাইভেট পড়ান কিনা, তাই খুব প্রাইভেটে পড়ান, কেউ টের না পায়।"

মাধুরীর কানে কিন্তু এ সব কথা ঠিকমতো ঢুকছে না। সে যদিও চপলার বন্ধুত্ব ভাল ক'রেই চায় এবং সেজন্য তার মন পাবার চেষ্টা প্রতিদিনই ক'রে আসছে, তবু চপলার একটা কথা তার মনে খচ্ ক'রে বিঁধে তার মনটাকে খারাপ ক'রে দিয়েছে। চপলা বলেছে, এটা ছোটলোকদের স্কুল।

তিন

মাধুরী, উমা, সাবিত্রী, কনক—এরা অনেক দিন ধ'রে এই স্কুলে পড়ছে, এদের মধ্যে বন্ধুত্বও আছে, কিন্তু স্কুলে এরা নিজেদের সাধ্যমতো, কখনো বা সাধ্যের বাইরে সাজ-পোশাক ক'রে আসে। এরা সকলেই মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মেয়ে। কারো বাবা ব্যবসায়ী, কারো বাবা উকিল, কারো বাবা ডাক্তার, কারো বাবা অফিসের কেরানি। মাধুরীর বাবা ছিলেন এক স্কুলের সহকারী শিক্ষক। অবস্থা এদের কারোই বিলাসিতা করবার মতো নয়, কিন্তু তবু স্কুলের মেয়েদের মধ্যে পরস্পর বেশ-বিন্যাসে একটা প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। এর হাত থেকে কারো নিস্তার নেই।

এই প্রতিযোগিতার মধ্যে কারো অবশ্য দেমাক নেই, খুব অহঙ্কারও নেই, কিন্তু তবু ওদের মনে মনে ভাল সাজ-পোশাকের দিকে বেশ একটা লক্ষ্য থাকে। এই রকম একটা ইচ্ছা খুবই ভাল। কারণ খুব দামী পোশাকের উজ্জ্বলতা না থাকলেও একটা পরিচ্ছন্নতাবোধ এই ভাবেই ওদের মনে জাগে।

স্কুলে যাবার সময় বেশি গহনা পরার রীতি নেই, পথে বিপদের সম্ভাবনা, সেজন্য যার গহনা নেই, আর যার আছে,—এই দুয়ের মধ্যে তফাত বেশি থাকে না। সেটাও ভাল।

তবু ওরই মধ্যে দু' একজন মেয়ে একটু বাড়াবাড়ি করার

চেষ্টা করে। দু'চারখানা অতিরিক্ত গহনায় জবড়জং হয়ে আসে, এবং তা দেখে অনেকে হাসেও।

মাধুরী তার মাকে ধ'রে বসেছে একখানা সিল্কের শাড়ী কিনে দিতে হবে। সাধারণ শাড়ী কিনতে তাব বাবা কখনো কৃপণতা করেন নি, মাঝে মাঝে দু'একখানা ভাল শাড়ীও কিনেছেন, তাঁর সাধ্যের বাইরেও গিয়েছেন দু'একবার। তবু তিনি ভেবেছেন, বেশ তো, স্কুলে বড়লোকদের মেয়েরা পড়ে, তাদের সঙ্গে মিশতে গেলে একটু ভাল শাড়ী চাই বৈ কি। ওতে মেয়ের মন ভাল থাকবে, নিজেদের দারিদ্র্যের জন্য প্রতিমুহূর্তে মনমরা হযে থাকলে পড়াশোনা ভাল হয় না, মনটাও ক্রমে ছোট হয়ে যায়। তাছাড়া তিনি দেখেছেন, যে-সব মেয়ে মাধুবীর কাছে আসে তাদেরও পোশাকের একটা পারিপাট্য আছে। তিনি ধ'রে নিয়েছেন মেয়েদের মধ্যে এটাই এখন চলতি, তাই এর মধ্যে যে কিছু অস্বাভাবিক থাকতে পারে তা তাঁর মনে হয় নি। শাড়ী কিনতে মাঝে মাঝে তাঁকে টাকা ধার করতেও হয়েছে, কিন্তু সে কথা তিনি মেয়েদের কাছে কখনো প্রকাশ করেন নি, করলে মনটা আরও ছোট হয়ে যাবে।

মাধুরীর কাছে অন্য মেয়েদের তিনি আসতে দেখেছেন বটে, কিন্তু এর মধ্যে একটা মজার ব্যাপার আছে। মাধুরীর বন্ধুরা কখনো বাড়ির ভিতরে আসে নি। মাধুরী বাইরে গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করেছে। মাধুবীর মা একদিন

মেয়েদের বাইরে আলাপ করতে দেখে বলেছিলেন, "ওদের ভিতরে ডেকে আনিস না কেন ?" তার উত্তরে মাধুরী তার মাকে বলেছিল, "কেন, ওদের বাড়িতে গেলেও তো কখনো বাড়ির ভিতরে যেতে বলে না, আমি বলব কেন ?"

"ওরা বলে না ব'লে তুই বলবি না কেন ?"

"ওরা ওদের অবস্থা বাইরের কাউকে জানতে দিতে চায় না।"

"ও ! তাই ? তা তোর আর লজ্জাটা কিসের ? আমরা বড়লোক নই, তা তোর বন্ধুরা জানুক না।"

"না মা, এই বাড়িতে ? সে কিছুতেই আমি পারব না। কি আছে তোমাদের বাড়িতে ? না আছে ভাল চেয়ার টেবিল, না আছে ভাল আলমারি, খাট, বিছানা। ওরা যদি এ সব দেখে যায় তাহলে আর আমার সঙ্গে কথাই বলবে না।"

"বলিস কি ! তোর বন্ধু হয়ে তোর সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করবে ? তোর অবস্থা খারাপ জানলে ওরা যদি তোর সঙ্গে কথা বন্ধ করে, তাহলে ওরা তোর কেমন বন্ধু ?"

"তুমি জান না, মা, স্কুলের মেয়েদের বন্ধুত্ব ঐ রকমই। সেদিন কনক পারুলদের বাড়িতে গিয়েছিল—তার পর সে কি কাণ্ড, কনকের গল্প আর ফুরোয় না।"

"কিসের গল্প ?"

"শোন বলি। কনক গিয়ে দেখে পারুল অন্ধকার একটা ঘরে থাকে। দেয়ালগুলো ফাটা, বাড়িতে বিদ্যুতের আলো

নেই, হারিকেন লণ্ঠনের আলোয় এক ছেঁড়া মাদুরে ব'সে পড়ে। কনক হঠাৎ গিয়ে পড়েছিল, লজ্জায় মরে পারুল। গরিব ব'লে লজ্জা নয় মা, কি ক'রে কনককে খাতির করবে তাই ভেবে। পারুলের মা রান্না করছিল, পারুলের এক ভাইকে বাজারে পাঠিয়ে ছোট ছোট দুটো সিঙাড়া আনিয়ে তার সঙ্গে ফাটা পুরনো কাপে খানিকটা রঙ-করা জলের মতো চা খেতে দেয়। বলে, চা না খেয়ে যেতে পাবে না। কনক কোনো রকমে নাক বন্ধ ক'রে চায়ের কাপে চুমুক দিল। তারপর কি হ'ল জান মা? পারুলের ছোট্ট এক বোন ছিল, সে কনকের পাশে দাঁড়িয়ে "আমি সিঙাড়া খাব" ব'লে কাঁদতে লাগল। কনক দুটো সিঙাড়াই তাকে দিল, তবে তার কান্না থামল।"

মাধুরীর মার মুখখানা বড়ই বিষণ্ণ হয়ে এলো, বললেন, "তারপর থেকে বুঝি পারুলের সঙ্গে তোমরা কথা বন্ধ করেছ?"

"আমি করিনি, মা, কনক করেছে। কনক কি রকম ঠাট্টা ক'রে যে পারুলদের বাড়ির কথা বলছিল, শুনে আমার কিন্তু বড় দুঃখ হচ্ছিল।"

মাধুরীর মনে দুঃখ জাগা অন্যায় নয়, তার মনটা একদিক দিয়ে বড়ই নরম। সে কারো দুঃখ দেখতে পারে না। মনে হয় তার হাতে যদি যথেষ্ট টাকা থাকত, তাহলে সবার দুঃখ সে দূর করত। তার বাবার দুঃখও তার মনে বড় দুঃখ দেয়।

যখন ভিখারীরা দরজায় এসে চেঁচাতে থাকে তখন খাবার জিনিস যা থাকে সে তাই তাদের দিয়ে ফেলে। তাদের বাড়িতে অন্য কেউ এলে তাকে ভাল অভ্যর্থনা না করা হ'লে সে অন্য ঘরে লুকিয়ে থাকে। নিজ হাতে সে কাউকে কম জিনিস খেতে দিতে পারে না। আয়োজন ভাল হ'লে তার আনন্দের সীমা থাকে না। বন্ধুবান্ধবদের ভাল ক'রে খাইয়ে তার বড়ই তৃপ্তি। তার বাচ্চা বন্ধু আছে দু'তিনজন, তারাই শুধু তার বাড়ির ভিতরে আসতে পারে, অল্প পরিচিতদের সে ভিতরে ডাকে না।

মাধুরীর বয়স পনেরো বছর মাত্র। সুতরাং অনেক দিকেই তার বুদ্ধি এখনো কাঁচা। সে যা সত্য মনে করে, তার বাইরেও যে সত্য থাকতে পারে তা দেখবার মতো চোখ তার এখনো হয় নি। তাই এই মাধুরীই অন্যদের অনুকরণ ক'রে যখন নিজের দারিদ্র্য ঢেকে রাখতে চায়, তখন তাতে অবাক হবার কিছু নেই। সে যে গরিব, এ লজ্জা তার এসেছে অন্য দু'একজন মেয়েকে দেখে, এবং তাদের দেখাদেখি সেও চপলার চোখে আরও একটুখানি উঁচুতে উঠতে চায় ভাল শাড়ী প'রে। তাই সে তার মায়ের কাছে সেদিন একখানা ভাল সিল্কের শাড়ী চেয়ে বসল।

মেয়ে ভাল শাড়ী পরুক কোন্ মা না চায়? মেয়ের মনের ইচ্ছা আর মায়ের মনের ইচ্ছা এক সুরেই তো বাঁধা থাকে। মায়ের ছেলেবেলায় যে সব সাধ ছিল, মেয়ের মনে

সেই সব সাধ যখন জাগতে থাকে তখন তা মেটাতে পারলে যেন মায়ের নিজেরই সাধ মেটে। মায়ের যে সাধ মেটেনি, মেয়ের মধ্যে সেই সাধ পূর্ণ হতে দেখলে মায়ের মন ভরে। মাধুরীর মা যখন মাধুরীর মতোই ছোট ছিলেন তখন তিনি নিজের মনের মতো শাড়ী সব সময়েই পরেছেন। তাঁর বাবার অবস্থা ভাল ছিল, তা ভিন্ন আগে শস্তাগণ্ডার দিন ছিল। কিন্তু মাধুরীর বাবা স্কুলের শিক্ষক, মাইনে পান মাত্র দেড় শ' টাকা, টিউশন ক'রে আরও সামান্য কিছু পান, কিন্তু কলকাতা শহরে যুদ্ধের বাজারে এ টাকায় কিছুই হয় না।

তিনি মেয়েকে সাদাসিদে ভাবেই স্কুলে যেতে বলেন, কিন্তু তাই ব'লে মাধুরীর মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কিছু করেন না। তাই সিল্কের শাড়ীর কথা শুনে তিনি একটু চিন্তিত হলেন, যুদ্ধের বাজারে একখানা ভাল শাড়ী ষাট টাকার নীচে পাওয়া যায় না।

মাধুরীর মা বললেন, "তা হোক, কখনো তো দামী কিছু ও পরেনি, শখ হয়েছে, একখানা যেমন ক'রে হোক কিনে দাও। ঘরেও দু'একখানা ভাল শাড়ী থাকা ভাল, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।"

মাধুরীর বাবা এই "ভবিষ্যৎ" কথাটি বুঝতে পারলেন। মেয়ের ভবিষ্যতের জন্য তিনি স্ত্রীর পরামর্শমতো মাঝে মাঝে কিছু কিছু সোনার জিনিস কিনে রেখেছেন।

তাই তিনি স্ত্রীর মনে আঘাত দিলেন না। ষাট টাকায়

একখানা শাড়ী কেনার মতো অবস্থা তাঁর এ সময় ছিল না, কিন্তু তবু তিনি বললেন, "বেশ তো, চাইছ যখন, তখন এনে দেব একখানা।"

সিল্কের শাড়ী আসতে খুব বেশি দেরি হ'ল না, এবং তার দামও ঠিক ষাট টাকা নয়, বোধ হয় তার প্রায় দ্বিগুণই হবে। কিন্তু কি ক'রে যে তা কেনা সম্ভব হ'ল তা কেবল যিনি কিনলেন তিনিই জানলেন, আর কেউ জানতে পারল না।

শাড়ী পেয়ে মাধুরীর যে কি আনন্দ হ'ল। সিল্কের শাড়ী সে আগেও পরেছে, কিন্তু এমন চমৎকার শাড়ী সে কখনো পরে নি। শাড়ী নিয়ে সে একা ঘরে কখনো হাতের সঙ্গে, কখনো গালের সঙ্গে চেপে তার কোমলতার স্পর্শ অনুভব করতে লাগল। কি সুন্দর ঠাণ্ডা, কি সুন্দর মোলায়েম, কি চমৎকার ডিজাইনের ছাপ। এই শাড়ি প'রে সে তার ক্লাসের ধনী মেয়ের মতোই মান্য হতে পারবে সে কথা কল্পনা করতেও তার বুক দুরুদুরু করতে লাগল।

তার খুব ইচ্ছে হ'তে লাগল শাড়ীখানা তখুনি পরে দেখে, কিন্তু কি ভেবে তা আর করল না। আগেই সে পুরনো ক'রে ফেলবে না। কিন্তু সিল্কের শাড়ী কি একবার পরলে পুরনো হয়? সে শাড়ীর একটা পাশ খুলে নিয়ে মুঠোর মধ্যে চাপ দিয়ে দেখল ভাঁজ নষ্ট হয় না। তখন আর তার ধৈর্য রইল না, শাড়ীখানা আলগোছে খুলে প'রে ফেলল। প'রে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে দেখল। দেখল

সে যেন আর প্রতিদিনের চেনা মাধুরী নেই, বদলে গেছে। সে যেন অনেক উপরে উঠে গেছে, তার মনে একটা নতুন সম্ভ্রম জেগে উঠেছে। আনন্দে উচ্ছ্বাসে মন ভরে উঠল তার।

এক মুহূর্তে পৃথিবী তার চোখে বদলে গেল, মনে হ'ল তার জন্ম সার্থক, মনে হ'ল তার বাবা মা তাকে কত ভালবাসে, এবার থেকে সে পড়াশোনায় মন দেবে, সে সকলের উপরে উঠবে, সে তার বাবা মাকে খুশি করবে। তারপর যেন একটা সুখের স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে সে শাড়ী ছেড়ে বহু যত্নে সেখানা আবার ভাঁজ ক'রে তুলে রাখল, পরদিনই সে ওখানা প'রে স্কুলে যাবে। পূজোর পরে কাল স্কুল খুলবে।

চার

যুদ্ধের নিরানন্দ অন্ধকার রাতের আড়ম্বরহীন পূজা শেষে স্কুল খুলেছে, কিন্তু কার্তিক মাসেও আকাশ মেঘে ভরা, বৃষ্টির পালা চলেছে কিছুদিন ধ'রে। এই বৃষ্টিতে নতুন শাড়ীখানা ভিজে নষ্ট হয়ে যাবে যে। মাধুরীর মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু তবু শাড়ীখানা না পরলেই চলবে না।

স্কুলে সবাই অবাক হয়ে গেল মাধুরীর নতুন শাড়ী দেখে। তবু কেমন মানিয়েছে সে কথা কেউ বলে না, সবাই দাম জিজ্ঞাসা করে পলার মুখের দিকে চেয়ে থাকে সবাই,

যেন সে প্রশংসা করলে তবেই ও শাড়ী কেনা সার্থক, নইলে ওর কোনো দাম নেই। চপলা কিন্তু কোনো কথাই বলল না। পিছন থেকে অমলা না নমিতা মাধুরীকে জিজ্ঞাসা করল—"নতুন কিনেছিস নাকি রে?"

মাধুরী বলল, "হ্যাঁ ভাই, নতুন কেনা।"

"কত দাম নিয়েছে?"

"তা তো জানি না ভাই, আমাকে বলেনি।"

চপলা এতক্ষণে কথা বলল। সে শাড়ীর আঁচলখানা একটুখানি ছুঁয়ে দেখে বলল, "টাকা পঞ্চাশেক হবে, সেও আবার যুদ্ধের বাজার বলেই। নইলে আগে দশ বারো টাকাতেই এ রকম শাড়ী পাওয়া যেত।"

মাধুরীর মনটা দমে গেল, কিন্তু চপলাকে সে কিছু বলতে পারল না, কারণ শাড়ীর দাম সত্যিই সে কিছু জানে না। তার আরও দুঃখ হ'ল এই ভেবে যে তার বাবা কেন তাকে শাড়ীর দাম বলে নি। আগে যদি সে জানত সবাই কেবল দামের কথাই জিজ্ঞাসা করবে, তা'হলে দাম জেনে আসতে পারত। শাড়ী হোক গহনা হোক, যে পরে, তাকে সেগুলো কেমন মানিয়েছে তা কেউ বলে না। দাম বেশি হ'লে সবই মানায়, কম হ'লে মানায় না।

শাড়ী কেনার আগে একবার তার একটা কথা কানে এসেছিল—শাড়ী ষাট টাকার নীচে ভাল পাওয়া যায় না।

সেই কথার উপর ভরসা ক'রে মাধুরী বলতে বাধ্য হ'ল যে বোধ হয় দাম এক শ' টাকা।

কেউ কেউ এ কথায় অবাক হ'ল, কেবল চপলা চুপ ক'রে রইল। তার মনের মধ্যে একটা জ্বালা ধ'রে উঠল। সে ভাবতে লাগল একবার সে মাধুরীকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তার ঐশ্বর্য দেখিয়ে আনবে।

মাধুরীর শাড়ী আরও একটি মেয়ের মনে অশান্তি জাগাল। সে হচ্ছে কনক। তার বাবা উকিল, অবস্থা তার খারাপ নয়। পোশাক অলঙ্কার তার ভালই আছে। কিন্তু এতদিন সে তার পোশাক আর অলঙ্কার নিয়ে চপলার সঙ্গে পাল্লা দেবার কথা ভাবেনি, কিন্তু আজ মাধুরীর শাড়ী দেখে সে মনে মনে একটা কথা বুঝতে পারল। বুঝতে পারল মাধুরী চপলার সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়। এ কথা মনে হতেই তার যেন চোখ খুলে গেল। মাধুরী যে তার চেয়ে গরিব, এতদিনের চালচলনে কনক সেটা ধরেই নিয়েছিল। কাজেই, তার চেয়ে খারাপ অবস্থা হয়েও মাধুরীর এই মতলবটা তার ভাল লাগল না। মাধুরী তার মনে হিংসে জাগিয়ে তুলল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, যেমন ক'রে হোক মাধুরীকে লজ্জা দিতে হবে। চপলার চেয়ে সে বড় লোক না হতে পারে, কিন্তু টাকাপয়সার জন্য যদি কাউকে খাতির করতে হয় তা'হলে সে খাতির তারই পাওনা, মাধুরীর নয়।

কনক সেদিন আর পড়ায় মন দিতে পারল না। টীচার কি পড়ালেন কিছুই তার কানে গেল না।

পাঁচ

ক্লাসের পিছনের একটি কোণের দিকে কিছুদিন থেকে একটি মেয়ে এসে বসছে, তার নাম কমলা। খুবই সাদাসিদে, শাড়ী গহনায় কিছুমাত্র মনোযোগ নেই, মুখখানা শান্ত, বড় বড় দুটি চোখ, কিন্তু সে চোখের দৃষ্টি যেন তার মনের দিকে, বাইরের কোনো কিছু যেন তার সহজে চোখেই পড়ে না।

সে চুপচাপ এসে বসে, কারো সঙ্গে খুব বেশি কথা বলে না, খুব শান্ত সংযত ব্যবহার, পড়াশোনায় বড়ই মনোযোগ, কিন্তু তার সাজ-পোশাক দেখে কেউ তার সঙ্গে বড় একটা মেশে না।

এক এক দিন সে টীচারকে এমন এক একটা প্রশ্ন ক'রে বসে যা শুনে অন্য মেয়েরা অবাক হয়, কিন্তু চাপা সুরে ঠাট্টাও করে। এমন সব প্রশ্ন যা অন্য মেয়েদের মনে কখনো আসে না। তাদের মনে হয় কমলা মেয়েটা ছেঁড়া শাড়ীর লজ্জা ঢাকতে চায় চালিয়াতি ক'রে।

কমলা পড়াশোনায় যে খুব ভাল তা নয়, কিন্তু জানবার আগ্রহ তার খুবই বেশি। মনে হয় যেন বেশিক্ষণ পড়াশোনা নিয়ে থাকে না, ক্লাসে এসে যেটুকু শেখে তার বেশি শেখবার

যেন তার সময় নেই। সেই জন্যই ক্লাসে তার মনোযোগ খুব বেশি দেখা যায়।

একদিন এক গুরুতর ঘটনা ঘটে গেল এই কমলাকে নিয়ে। ক্লাসে ইংরেজী পড়ানো হচ্ছিল। ইংরেজী বইখানা এ দেশীয় কোনো লেখকের লেখা। তাতে একটি বাক্যের অংশের অর্থ, 'মাউন্ট এভারেস্ট অথবা গৌরীশঙ্কর' চূড়া পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতচূড়া। বীণাদি অর্থ ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন—এভারেস্টের চেয়ে উঁচু চূড়া পৃথিবীতে আর নেই, এরই আর এক নাম হচ্ছে গৌরীশঙ্কর।

কমলা হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল।

বীণাদি তার দিকে চাইলেন।

কমলা বলল, "বীণাদি, এভারেস্ট আর গৌরীশঙ্কর তো এক নয়।"

বীণাদি অবাক হলেন এ কথায়। জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ক'রে জানলে?"

কমলা বলল, "আমার একখানা ভাল অ্যাটলাস আছে, তাইতে এভারেস্ট খুঁজতে গিয়ে তার কাছাকাছি গৌরীশঙ্করও পাওয়া গেল। দেখলাম দুটো আলাদা চূড়া এবং দুয়ের উচ্চতাও আলাদা। এভারেস্টের উচ্চতা ২৯,০০২ ফুট, গৌরীশঙ্করের উচ্চতা ২৩,৪৪০ ফুট।"

বীণাদি বললেন, "দেখতে হবে তো। আমরা তো এতদিন জানি ও দুটো একই।"

কমলা কোনো প্রতিবাদ করল না। বীণাদিও আর কিছু বললেন না। কথাটা চাপা প'ড়ে গেল। কিন্তু এই উপলক্ষে চপলা কনক এবং ওদের দলের সবাই কমলার চালিয়াতি দেখে ওর উপর আরও চটে রইল।

চপলা মাধুরীকে বলল, "দেখছিস মেয়েটার চাল? দু' টাকা দামের শাড়ীর লজ্জা ঢাকতে চায় ও বিদ্যা জাহির ক'রে!"

মাধুরী এ কথায় সম্পূর্ণ সায় দিল।

চপলার ক্রমেই মনে হতে লাগল, কমলা যেন তাকেই ছোট করার জন্য বড় বড় কথা বলতে চায় টীচারের সঙ্গে। কেন বাপু, ভাল শাড়ী না জোটে তাতে কে তোমায় নিন্দা করছে, আর কে তোমাকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। আর, আমাদের যদি জোটে তা নিয়ে আমরা কি তোমার সঙ্গে শত্রুতা করছি?

চপলা কমলার উপর ভীষণ চটে গেল। এমন কি ওকে জব্দ করবার জন্যও একটা কৌশল সে ভেবে রাখল।

ছুটির সঙ্গে সঙ্গে বীণাদি ক্লাসে ঢুকে বললেন, "কমলার কথাই ঠিক, মাউণ্ট এভারেস্ট আর গৌরীশঙ্কর এক নয়।"

ক্লাসের সবাই স্তম্ভিত হ'ল একথা শুনে। স্তম্ভিত হ'ল কমলার জয়লাভে, আর বীণাদির হার স্বীকারে। চপলা শুধু নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে করতে লাগল।

বীণাদি বলতে লাগলেন, "আমারই ভুল হয়েছে। আর

সে ভুল তোমাদের কাছে স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই। আমরা অনেক কিছুই তো জানি না, তাতে লজ্জার কিছু নেই, যদি জানবার ইচ্ছাটি ঠিক থাকে।”

ক্লাসসুদ্ধ মেয়ে বীণাদির দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল। বীণাদি বলতে লাগলেন, “স্কুলের পরিচয়ে আমরা কেউ টীচার, কেউ ছাত্রী, কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা সবাই ছাত্রী। এই কথাটা তোমরা মনে রেখো। শুধু এই কথাটা বলবার জন্যই তোমাদের একটুখানি অপেক্ষা করতে বলেছিলাম।”

বীণাদি চ'লে গেলেন। সবার মধ্যে একটা গুঞ্জরণ আরম্ভ হ'ল। মেয়েরা নিজেদের মধ্যে নানা রকম মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগল। কমলা আগেই চ'লে গেছে, তাই ওদের আর কোনো অসুবিধা রইল না।

বীণাদির হার স্বীকার কনক সহজভাবে নিতে পারল না, চপলাও এর মধ্যে মতলব খুঁজতে লাগল। অবশেষে ঠিক হ'ল বীণাদির বিয়ের কথা চলছে, বোধ হয় বিয়ে হবে দুই-একদিনের মধ্যেই, তাই আনন্দে তাঁর আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই।

চপলা বলল, “ছোটলোক, ছোটলোক! নইলে মেয়েদের সামনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে যা-তা বলে!”

বীণাদির বিয়ের কথা হচ্ছিল ঠিকই। মেয়েরা কোত্থেকে এ সব তথ্য সংগ্রহ ক'রে এনে নিজেদের মধ্যেই খুব বলাবলি করছিল ক'দিন।

ছয়

পরদিন ছুটির আগে আকাশে বর্ষাকালের মতোই মেঘ ঘনিয়ে এলো। একটু একটু বৃষ্টিও পড়তে লাগল, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'ল না।

এই বৃষ্টি দেখেই চপলার মাথায় এক বুদ্ধি চাপল। সে মাধুরীকে বলল, "আমার কি মনে হচ্ছে জানিস ?"

মাধুরী বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে বলল, "না, কি বল্ তো ?"

চপলা বেশ একটু বিনয়ের সুরে বলল, "আমার একটা কথা রাখবি ?"

মাধুরীর পক্ষে এ রকম প্রশ্ন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তবে কি সে যা আশা করেছিল, তাই হ'ল ? তার নতুন শাড়ী কি তাকে চপলার বন্ধু হবার যোগ্যতা দিল ? কত রকম কথা তার মনে এলো। চপলা তাকে করছে অনুরোধ! তার একটি আদেশ পেলে সে নিজেকে ধন্য মনে করে, সে তার অনুরোধ রাখবে না ? মাধুরী আনন্দে হঠাৎ কিছু বলতে পারল না।

চপলা আবার জিজ্ঞাসা করল, "রাখবি আমার অনুরোধ ?"

মাধুরী এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হয়েছে। বলল, "কেন রাখব না ? কি, বল্ না ?"

চপলা বলল, "আজ সোজা বাড়িতে না গিয়ে আমার সঙ্গে চল্ আমাদের বাড়িতে, বেশ খানিকটা সময় কাটানো যাবে গল্পগুজব ক'রে।"

মাধুরীর বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা লাফাতে লাগল তার এই হঠাৎ সৌভাগ্যে। তবু তার মনে হ'ল আগে বাড়িতে না গেলে তার মা কত কি ভাববে। মাধুরী চপলাকে বলল সে কথা।

চপলা বলল, "সে ভাবতে হবে না তোকে। সাবিত্রী তো তোদের গলিতেই থাকে শুনেছি, ওকে আমি ব'লে দিচ্ছি যাবার সময় তোর বাড়িতে ব'লে যাবে, কেমন ?"

চপলার বুদ্ধিতে মাধুরী খুশি হল।

চপলা বলল, "তোর বাড়ি ফেরবার ব্যবস্থাও আমি ক'রে দেব, আমাদের গাড়িতেই তোকে পৌঁছে দেওয়া হবে।"

এই আশাতীত সৌভাগ্য মাধুরীর যেন সহ্য হয় না। সে বলল, "না না, অতটা দরকার নেই, আমি একাই ফিরতে পারব।"

চপলা বলল, "সে হবে না, এই ব্ল্যাকআউটের অন্ধকার রাত, একা ফেরা ঠিক নয়।"

এ কথায় মাধুরীর নতুন একটা ভয় জেগে উঠল, এবং তা অন্ধকার পথের ভয়ের চেয়েও বেশি। চপলার ড্রাইভার অন্ততঃ দেখে যাবে কি রকম বাড়িতে সে থাকে। ও মা, কি লজ্জার কথা! কিন্তু চপলার আদেশ অমান্য করার সাধ্য তার আর ছিল না।

চপলা একটা জয়ের গর্বে মনে মনে খুশি হয়ে উঠল।

কারো মনে কৌতূহল, কারো মনে সন্দেহ এবং কারো মনে

সৌভাগ্যবতী মাধুরী গিয়ে উঠল চপলার গাড়িতে

ঈর্ষা জাগিয়ে সৌভাগ্যবতী মাধুরী গিয়ে উঠল চপলার গাড়িতে।

কিন্তু চপলাদের বাড়িতে এসে মাধুরীর অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল।

তার ঝকঝকে নতুন বাড়ির পরিবেশে সে নিজেকে পদে পদে বড়ই ছোট মনে করতে লাগল। কত রকম আসবাব, কত রকম দামী দামী সব জিনিস যা সে কখনো দেখে নি, এবং কখনো সে যার স্পর্শ পায় নি। সে শুধু বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে চুপ ক'রে রইল। চপলা কত বড়, তার তুলনায় সে তো পথের ভিখারী।

চপলার মা কিন্তু ভালমানুষ। তিনি মাধুরীকে দেখে খুব খুশি হলেন, তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

মাধুরী মন্ত্রের মতো সব ব'লে গেল। চপলা দেখিয়ে দিল তার বাবাকে—বলল, "ওই যে তিনি অফিস ঘরে ব'সে আছেন।" মাধুরী বলল, "ওঁকে প্রণাম ক'রে আসি, চল।"

চপলা মাধুরীকে তার বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। বলল, "আমাদের সঙ্গে পড়ে।" চপলার বাবা খাতা থেকে মুখ তুলে বললেন, "বেশ মেয়েটি।"

মাধুরী তাঁকে প্রণাম করল।

চপলার বাবা বললেন, "মাঝে মাঝে এসো মা, যারা এক সঙ্গে পড়ে, তাদের ক্লাসের বাইরেও মাঝে মাঝে একসঙ্গে থাকা ভাল।"—ব'লে খাতায় মন দিলেন।

চপলা ওকে নিয়ে গেল সেখান থেকে। চপলার মা বললেন, "কিছু খেয়ে যাও আগে।"

মাধুরী সবই যন্ত্রের মতো মেনে যাচ্ছে। এই নতুন পরিবেশটাকে সে কোনো মতেই নিজের মনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না।

চপলার মা মাধুরীকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার বাবা কি করেন, মাধুরী ?"

মাধুরীর মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল। সে চট্ ক'রে হঠাৎ বলতে পারল না যে তার বাবা স্কুলের শিক্ষক। স্কুলের শিক্ষক যে কত ছোট তা সে এ বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ক'রে ফেলেছিল। তাই সে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বড় অস্বস্তি বোধ করল, কিন্তু কিছু না ব'লেও তো উপায় নেই। তার মনে হ'ল এ রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা ভারী অন্যায়। পরের ঘরের খবর জানতে চাওয়ার মধ্যে কেমন যেন একটা অন্যায় কৌতূহল আছে, এ কথাটা আজ সে নতুন বুঝতে পারল।

মাধুরী তার বাবার পরিচয় দিল বটে কিন্তু কিছু বাড়িয়ে বলল। বলল, "স্কুলে পাঁচ শ টাকা মাইনের কাজ করেন।"

"বেশ ভাল মাইনে, সরকারী স্কুল বুঝি ?"

"হ্যাঁ, সরকারী স্কুল।"

কথা এখানেই শেষ হ'ল না। চপলার মা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের দেশ কোথায় ?"

মাধুরী বলল, "নদীয়া জেলায়।"

কিন্তু এই কথাটি বলবার সঙ্গে সঙ্গে মাধুরীর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে এতক্ষণ গভীর জলে হাবুডুবু খাচ্ছিল, এইবার যেন পা হঠাৎ মাটির স্পর্শ পেল। মাধুরী 'নদীয়া জেলা' ব'লেই থামল না, তার সঙ্গে আরও যোগ করল, "দেশে আমাদের অনেক সম্পত্তি আছে, বাড়ি আছে, কিন্তু বাবা পড়াতে ভালবাসেন, তাই কলকাতায় থাকেন।"

বলতে বলতে মাধুরীর বুকের ভিতরটা ত্বরুত্বরু ক'রে উঠছিল, মনে হচ্ছিল ঠিকমতো বলা হচ্ছে না, চপলার মা বোধ হয় বুঝতে পারছেন—সবই বানিয়ে বলা, মিথ্যে কথা।

কিন্তু চপলার মার কথায় তার ভয় কেটে গেল। তিনি বললেন, "তাই বল, মা, নইলে তোমার বাবার যা উপার্জন বললে, ওতে কি আর এখন কলকাতায় থাকা চলে?"

মাধুরীর বুকের উপর থেকে যেন একটা পাথর নেমে গেল।

ইতিমধ্যে জলখাবার এসে গেল। বাড়ির পরিচারিকা বড় বড় ত্ব'খানা বিলিতি নক্সা করা ডিশে বড় বড় সন্দেশ আর পান্তুয়া সাজিয়ে এনে দিল ত্বজনের সম্মুখের টেবিলে।

চপলার মা সস্নেহে মাধুরীকে বললেন, "খাও মা, একটুখানি মিষ্টিমুখ কর।"

মাধুরী চেয়ে দেখল ডিশের দিকে। বলল, "এত খাব কি ক'রে?"

"এত আবার কোথায় ? তোমরা ছেলেমানুষ, নাও খেয়ে নাও। লজ্জা করতে নেই।"

চপলা বলল, "নে আরম্ভ কর্।"

মাধুরী সন্দেশে হাত দিতে বিস্ময়ে অনুভব করল সন্দেশ বরফের মতো ঠাণ্ডা। এ কি ক'রে হ'ল বুঝতে পারল না সে। কি রকম অস্বস্তি বোধ হতে লাগল আবার! খেতে যত ভাল লাগছে মনটা তত যেন লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছে। কেন সে গরিবের ঘরে জন্মেছে, কেন তার বাবা সামান্য টাকা আয় ক'রে সুখে আছে। মাধুরীর মনটা এই সব চিন্তায় ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল।

চপলার মা মাধুরীর সঙ্কোচ দেখে স্নেহের সুরে বলতে লাগলেন, "মাধুরী, তুমি বোধ হয় নতুন জায়গায় এসে লজ্জা পাচ্ছ। কিন্তু চপলা তো তোমার বন্ধু, তাকে তুমি নিজের বোনের মতোই মনে ক'রো। দেখবে তা'হলে আর কোনো লজ্জা বা সঙ্কোচ থাকবে না। তুমি যখন ইচ্ছে এসো এ বাড়িতে, তবে তো ভাল লাগবে আমার।"

এ সব কথায় চপলা যে খুব খুশি হচ্ছিল তা মনে হ'ল না, কিন্তু এই স্নেহের সম্ভাষণে মাধুরীর মন গ'লে গেল। সে মুহূর্তের জন্য নিজের অবস্থা ভুলে গেল। আনন্দে তার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরোল না।

চপলার মা এবারে ওদের মুক্তি দিলেন, বললেন, "এইবার তোমরা ও ঘরে যাও, গল্পসল্প করগে, কেমন ?"

রেফ্রিজারেটর খুলে বোতল থেকে এক গ্লাস জল ঢেলে চপলা খেল, মাধুরীকেও এক গ্লাস দিল

মাধুরী চপলার পড়ার ঘর দেখে অবাক হয়ে গেল। মোটা গদি-আঁটা চেয়ার, ডেস্কটি কি দামী, আয়নার মতো চকচক করছে। বইয়ের শেলফটি যে কত দাম কে জানে। টেবিলের উপর একটি মূল্যবান শেড দেওয়া সুন্দর টেবল-ল্যাম্প, ব্ল্যাকআউটের রাত্রের উপযুক্ত এক দিকে মাত্র খোলা। কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাহুল্য জিনিস একটিও নেই, দু'খানা চেয়ার, একটি ডেস্ক, একটি শেলফ। একটু দূরে একটি সুন্দর স্ট্যাণ্ডে একটি ছোট্ট রেডিও সেট।

মাধুরী কি বলবে ভেবে পায় না।

চপলা মনে মনে বুঝতে পারছে মাধুরীর অবস্থা, তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। চপলা বলল, "এই রেডিওতে মাঝে মাঝে ভাল প্রোগ্রাম শুনি। কেমন লাগছে তোর এ সব দেখে?—উঃ, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, চল্ ও ঘরে, জল খেয়ে আসি। তুই খাবি জল?"

পাশের ঘরে গিয়ে রেফ্রিজারেটর খুলে বোতল থেকে এক গ্লাস জল ঢেলে চপলা খেল, মাধুরীকেও এক গ্লাস দিল।

মাধুরী এবারে স্তম্ভিত হ'ল, কোনোমতেই বুঝতে পারছিল না, বিনা বরফে এত ঠাণ্ডা জল কি ক'রে একটি ছোট্ট আলমারিতে থাকতে পারে। কিন্তু চপলা কি মনে করবে ভেবে কিছু বলতে পারল না। সে এ জিনিস আগে কখনো দেখেনি।

চপলা নিজে থেকেই বলতে লাগল, "দেড় হাজার টাকা

চপলা একটি অতি চমৎকার কাঠের আলমারি থেকে তার শাড়ী একটার পর একটা দেখাতে লাগল

দিয়ে এই রেফ্রিজারেটর সেদিন বাবা কিনে এনেছে—টাকা খরচ বাবা গ্রাহ্যই করে না, যখন তখন আমার জন্য শাড়ী আসছেই। দেখবি সব? আয় আমার সঙ্গে।"

মাধুরীকে প্রায় টেনে নিয়ে গেল চপলা। মাধুরীর মন থেকে অবাক ভাবটা এতক্ষণে কেটে গেছে। সে বুঝতে পেরেছে চপলার বাবা খুবই বড়লোক, তাই চপলার যে অনেক শাড়ী আর অনেক গহনা থাকবে, তাদের বাড়ির যে প্রত্যেকটি ঘর দামী আসবাবে সাজানো থাকবে, সেটাই তো স্বাভাবিক।

চপলা একটা অতি চমৎকার কাঠের আলমারি থেকে তার শাড়ী একটার পর একটা দেখাতে লাগল। মাধুরীর কথা এতক্ষণে একটু সহজ হয়েছে। সে বলল, "তোমার শাড়ীগুলো সত্যিই খুব দামী আর খুব সুন্দর।"

চপলা এ কথায় যে খুব খুশি হ'ল তা নয়। খুশি হ'ত, মাধুরী যদি বলত, "এমন শাড়ী জীবনে দেখিনি"—বা ঐ রকম বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাওয়ার মতো কোনো কথা। তাই সে হঠাৎ তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে বসল, "আচ্ছা মাধুরী, তোদের বাড়িতে রেফ্রিজারেটর আছে?"

মাধুরীর মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল—সে বিরক্তভাবে বলল, "না।"

চপলা যেন এ কথায় একেবারে আকাশ থেকে পড়ল, বলল, "বলিস কি, এই গরমে তোরা জল খাস কেমন ক'রে?

তাছাড়া ওতে খাবার রাখলে কত টাটকা থাকে, খেতে কেমন আরাম লাগে।"

মাধুরী ঠাণ্ডা সন্দেশের অর্থ এতক্ষণে বুঝতে পারল। কিন্তু সে এ কথার কি উত্তর দেবে! সে বলল, "বেশি গরমে আমরা বরফ জল খাই। তাছাড়া খাবার তো আমাদের কিছু বাসী থাকে না, তাই আর কিছু দরকারও হয় না।"

চপলা একেবারে হেসে উঠল। বলল, "তুই যে কি বলিস! বরফ দেওয়া জল খাস? তোর ঘেন্না করে না বরফ খেতে? বরফ কি কেউ খায় নাকি?"

মাধুরীর আর বলবার কিছু রইল না। কেন সে যে বরফের কথা বলতে গেল! কিন্তু এত সহজে হার মানাও তো যায় না। দারিদ্র্যকে সে ঘৃণা করে, নিজের অবস্থার জন্য তার খুবই লজ্জা, কিন্তু আর একজন তাকে লজ্জা দেবে তা সে সহ্য করবে কেন? সে নিজে গরিবদের দেখলে দুঃখ পায়, সে জানে গরিবেরা কেবল করুণারই পাত্র, তাই আর কেউ তাকে গরিব ভাবছে এ কথা ভাবতে গেলে লজ্জায় সে এতটুকু হয়ে যায়। তাই সে তার দারিদ্র্য চপলার কাছে লুকোতে চায়। অথচ যা সে চায় তাই সে আজ পারছে না। প্রতি কথায় সে যেন ধরা প'ড়ে যাচ্ছে। ভিতরে ভিতরে মন তার শক্ত হয়ে উঠছে। মনের এ রকম অবস্থায় বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়, জেদ বাড়তে থাকে এবং ভুল পথ জেনেও ভুল পথে চলবার জন্য রোখ চেপে যায়। মাধুরীরও তাই হ'ল।

সে নিজেকে যতখানি ছোট মনে করতে লাগল, নিজেকে ততখানি বড় ক'রে দেখাবার জন্য সে মরীয়া হয়ে উঠল। সে বলল, "বাবা আমাকে কোনো রকম বিলাসিতা করতে দেবে না ব'লে পণ করেছে। বাবা বলে, আমি কি তোদের যা খুশি কিনে দিতে পারি না? কিন্তু এখন স্কুলে পড়ার সময়, এখন কেবল পড়ার দিকেই যাতে মন থাকে তাই দেখতে হয়।"

চপলা হেসে বলল, "কি যে বলিস তুই! বাড়িতে রেফ্রিজারেটর থাকলে পড়া হয় না, রেডিও থাকলে পড়া হয় না, এমন কথা তো বাবা কখনো শুনিনি। মা—মা—শোন।"

চপলা চিৎকার ক'রে মাকে ডাকল। চপলার মা একটু দূরেই ছিলেন, তিনি কাছে এসে বললেন, "কি রে?"

চপলা বলল, "মাধুরী বলছে কি শুনবে? ওর বাবা নাকি ওদের একটু আরামে থাকতে দেবে না, সেইজন্য ওদের বাড়িতে রেডিও নেই, রেফ্রিজারেটর নেই। অথচ দেখ মা, ওর বাবা ওকে সিল্কের শাড়ী কিনে দিয়েছে!"

মাধুরী লজ্জায় মাটিতে মিশে গেল।

চপলার মা বললেন, "তা, কারো যদি সে রকম মনে হয় তাতে তোর মাথাব্যথা কেন? আজকাল অনেক দরকারী জিনিসকেও লোকে বিলাসিতা ব'লে উড়িয়ে দেয়, অবশ্য সেকেলে লোকেরাই ও রকম করে। কিন্তু করেই যদি, তা নিয়ে ঝগড়া করতে হবে এ কেমন কথা?"

মাধুরী এ কথায় অনেকটা জোর পেল। তার বাবাকে সেকেলে বলা হ'ল, তা হোক, তবু তো গরিব বলে নি! মাধুরী এইবার তাদের দেশের সম্পত্তির কথাটা আর একবার চপলার মাকে মনে করিয়ে দেবার জন্য বলল, "তাই ব'লে বাবা একেবারে অবুঝ নন, তিনি বলেন সম্পত্তির যা আয় তা তো তোর জন্যই জমিয়ে রাখছি, তোর যদি ইচ্ছে হয়, সে টাকা এখনই খরচ ক'রে ফেলতে পারিস। বাবা বলেন, কি চাস তুই বল্? এ কথার পর বাবার মনে দুঃখ দিতে ইচ্ছে করে না।"

চপলার মা বললেন, "সম্পত্তি আছে অথচ বেচারাকে চাকরি করতে হয়, একেই বলে অদৃষ্ট।"

চপলা জিজ্ঞাসা করল, "কত আয় হয় তোদের দেশের সম্পত্তি থেকে?"

মাধুরী বলল, "তা আমি জানি না, শুনেছি অনেক হাজার টাকা।"

চপলা একটুখানি দমে গেল এ কথা শুনে। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়। তার তখনি মনে হ'ল কয়েক হাজার আবার টাকা নাকি! কিছুই না। তার বাবার আয় কয়েক লাখ টাকা। অতএব মাধুরী তার চেয়ে অনেক ছোট।

এর পর চপলা মাধুরীকে তার ছোট্ট ফুলের বাগানটি দেখাতে নিয়ে গেল। বাড়ির পাশে এক খণ্ড জমিতে বাগান।

ফুল এখন বিশেষ কিছু নেই, আর কিছুদিনের মধ্যেই রঙে রঙে ভ'রে উঠবে বাগান। বৃষ্টি হয়ে গেছে, বাগানে বেড়াবার সুবিধা ছিল না, দেখানোটাই উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রে ওরা ফিরে এলো দু'চার মিনিট পরেই।

এর পর চপলা মাধুরীকে তাদের বাড়ির সব ঘর এবং আসবাবপত্র একে একে দেখাতে লাগল।

মাধুরীর এখন আর বিশেষ সঙ্কোচ হ'ল না। বড়লোকের বাড়ির আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এই সুযোগ তার জীবনে প্রথম এসেছে। সে একে একে সমস্ত দেখল এবং এই নতুন অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে তার ভালই লাগল।

সাত

চপলাদের গাড়ি যখন মাধুরীকে পৌঁছে দিয়ে গেল, মাধুরী নিজের বাড়ি থেকে একটু দূরে নামল। তার বাড়ির কাছে গাড়ি আনার সাহস তার কোনো মতেই হ'ল না। গাড়ির ড্রাইভারের কাছেও তার লজ্জার সীমা নেই।

গাড়ি থেকে নেমে মাধুরীর মাথা ঘুরতে লাগল। সে যেন এক স্বর্গরাজ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে এসে পড়ল কঠিন মাটির বুকে। বাড়ির দিকে তার পা যেন আর চলে না। বাড়ির এতদিনের পরিচিত ভাঙা সিঁড়িটি ইঁটের পাঁজর বের ক'রে

প'ড়ে আছে, তার উপর পা দিতেই মাধুরীর মন একটা অস্বস্তিতে ভ'রে উঠল। এক বেলাব মধ্যে তার বাড়িখানা এমন দরিদ্র হয়ে পড়েছে, এমন কুৎসিত হয়ে পড়েছে যে এ বাড়িতে সে এতদিন কেমন ক'রে যে কাটিয়েছে তা ভেবে অবাক হয়ে গেল। এমন মলিন নোংরা বাড়িতে ভদ্রপরিবার থাকতে পারে? কোথায়ও কোনো উজ্জ্বলতা নেই। মার্বেল পাথবের দেয়ালের কাছে এই বালিব আস্তর দেওয়া দেয়াল? আরশোলা ছারপোকা আর মশার রাজত্ব যেখানে, সেখানে আবার নাকি মানুষ থাকে!

এ রকম বাড়িতে থেকেও মাধুরী এতদিন মনে মনে একটা রঙীন জগৎ গ'ড়ে তুলেছিল। তাদের বাড়িকে বন্ধুবান্ধবদের দৃষ্টি থেকে আড়ালে বেখে সে বেশ সুখেই ছিল এতদিন, কিন্তু আজ তার বাড়ির নোংবা পরিবেশ তার নিজেরই কাছে অতি কুৎসিত হয়ে দেখা দিল।

মাধুরীর মা কত কথা জিজ্ঞাসা করলেন, সে কোনোটারই ভাল জবাব দিতে পারল না। কথা বলতে তার ভাল লাগছিল না। চপলাদের বাড়িতে যে-মিথ্যা পরিচয় সে দিয়ে এলো, সে পরিচয় কতদিন সে বজায় রাখতে পারবে, সেই ভাবনা তাকে অস্থির ক'রে তুলল বেশি।

রাত্রে সে কিছু খেল না, অনেক খেয়ে এসেছিল সে চপলাদের বাড়ি থেকে। না খেয়ে এলেও অবস্থা একই হত, আজ আর বাড়ির খাওয়া ভাল লাগত না। মাকে শুধু

জানাল চপলার মা অনেক খাইয়েছেন, আর কিছু সে খাবে না। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ল।

মাধুরীর মা একটু চিন্তিত হয়ে রইলেন।

পরদিন রবিবার স্কুলে যেতে হবে না ভেবে মাধুরী খুব আরাম বোধ করল।

ধনী কাকে বলে তা সে দেখে এসেছে। তার মনের সকল আনন্দ নিবে গেছে। পড়ার বই সামনে রেখে কত কথাই ভাবছে! যদি কখনো চপলা তার বাড়িতে আসতে চায়! যদি অন্য মেয়েরা তার বাড়িতে এসে পড়ে! অনেকে এসেছে বটে, কিন্তু বাড়ির ভিতরে আসেনি কখনো, মাধুরী বাইরে থেকেই তাদের সঙ্গে আলাপ করেছে। কিন্তু চপলা বা আর কেউ এখন তার বাড়ির চেহারা দেখলেও সে লজ্জায় ম'রে যাবে। চপলাকে পাল্টা একদিন নেমন্তন্ন করা দরকার। সে আসবে না এ তো ধ'রেই নেওয়া যায়, কিন্তু তবু একবার বলা উচিত। এবং বললে ভেবে নেওয়া উচিত, আসতেও তো পারে। এ কথা মনে হতেই মাধুবীর বুকের ভিতরটা যেন কেমন কেঁপে উঠল। দম বন্ধ হয়ে যাবে নাকি?

কিন্তু তবু ভাবনার শেষ হয় না। মাধুরী যে ব'লে এসেছে তার বাবা পাঁচ শ' টাকা মাইনে পান, দেশে অনেক সম্পত্তি আছে। কিন্তু যখন চপলা এসে দেখবে বাড়িতে একখানা ভাল চেয়ার নেই, একটা ভাল আলমারি নেই, তখন মাধুরী তাকে কি বলবে?

নাঃ, আর ভাবা যায় না।

মায়ের ডাক শুনে মাধুরী রান্নাঘরে গেল। মা বললেন, "দু'খানা তরকারী কুটে দে।" এ ডাকে তার ভালই লাগল, কাজে লাগলে দুর্ভাবনাটা কিছুক্ষণ ভুলে থাকা যাবে।

মেয়ের মনমরা ভাব দেখে মা জিজ্ঞাসা করেন, "তোর কি অসুখবিসুখ হ'ল কিছু?"

"না মা, কিছুই হয়নি। কেন যেন কিছু ভাল লাগছে না, তাই।"

"কারো সঙ্গে ঝগড়াটগড়া করেছিস?"

"না, মা।"

"দেখ্, আমার কাছে কিছু গোপন করিস না, চপলাদের বাড়ি থেকে আসার পর থেকে তুই যেন বদলে গিয়েছিস। তারা তোকে কিছু বলেছে?"

"না মা, তারা কিছু বলেনি। তারা মস্ত বড়লোক, ভাবছি আমি চপলাকে কোন্ সাহসে পাল্টা নেমন্তন্ন করি!"

"তাতে কি হয়েছে, বন্ধু বন্ধুর বাড়িতে আসবে, তাতে আবার ভাবনার কি আছে?"

"না না, এ বাড়িতে ডাকা চলবে না তাকে।"

"তোর সবই সৃষ্টিছাড়া কথা। কেন, এ বাড়ি দেখলে তোকে আর সে পছন্দ করবে না? তা যদি হয় তা'হলে এ বন্ধুত্ব মিটিয়ে ফেলাই তো ভাল।"

"আমি তো আগে জানতাম না।"

"না না, তুই নিশ্চয় তাকে আসতে বলবি।"

"না মা, তুমি সে কথা বুঝতে পারবে না, এখানে তাকে ডাকা চলে না।"

মাধুরীর মায়ের মনটা খারাপ হয়ে গেল। ধনীর ঐশ্বর্যের কাছে মেয়ে নিজেকে এত ছোট মনে করে? তবে কি ওর মনের দিক দিয়ে কোনো ঐশ্বর্য নেই?

মাধুরী তার মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বলল, "মা, তুমি আমাদের কথা নিয়ে কিছু ভেবো না, চপলাকে আমি এখানে আসতে বলব না, তা'হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আর, সে এ বাড়িতে আসতেও চাইবে না।"

"বেশ তো, তোর যা খুশি কর্।"—ব'লে তিনি ওখান থেকে উঠে গেলেন। তাঁর চোখে যে দু' ফোঁটা জল দেখা দিয়েছিল তা মাধুরী দেখতে পেল না।

আট

বেলা তখন দশটা হবে। রবিবার। মাধুরীর বাবা একখানা বই রচনায় নিযুক্ত আছেন। মাধুরী তার ঘরের বইগুলো তার সস্তা দামের শেলফে গুছিয়ে রাখছে, এমন সময় মোটরের হর্ন বেজে উঠল পথে। কান পেতে রইল সে দিকে। ইলেকট্রিক হর্ন, ঠিক চপলাদের গাড়ির মতো।

শোনা গেল দরজা খোলার শব্দ, তার বাবার গলার

আওয়াজ এবং এক অচেনা লোকের গলার আওয়াজ। বোঝা গেল তার বাবা ভদ্রলোককে ঘরে এনে বসালেন।

মাধুরীর কৌতূহল বেড়ে গেল। নতুন কে আসতে পারে এ বাড়িতে! মোটরে এসে দেখা করার মতো বন্ধু তার বাবার কে আছেন? দু' একজন যাঁরা আছেন মাধুরী তাঁদের চেনে।

মাধুরী একটু একটু ক'রে এগিয়ে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, টুকরো কথা যদি দু' একটি কানে আসে।

ক'দিন আগে তার বাবা ও মায়ের মুখে তার বিয়ের কথা শুনেছিল দূর থেকে, আজ এই আগন্তুকের আবির্ভাব তার মনকে সন্দেহে ভ'রে তুলল। খুব ভয়ে ভয়েই সে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। এই কৌতূহল কোন্ মেয়েটিই বা দমন করতে পারে!

না, বিয়ের কথা নয়। কিন্তু তবু এমন কথা যা মাধুরীর কাছে একেবারেই প্রীতিকর হ'ল না, এর জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তার চোখের সামনে যেন একটা অচেনা জগৎ আবির্ভূত হ'ল। একটা মস্ত জিনিস তার বাবা তার কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন, সেই গোপন জিনিসটি তার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল, মাধুরীর মনে একটা ধাক্কা লাগল। দুঃখে ঘৃণায় সে যেন ম'রে গেল।

তার বাবা টাকা ধার ক'রে তার জন্য যা কিছু করেছে—গহনা, শাড়ী, জামা, জুতো, সেই টাকা আদায় করতে লোক

এসেছে! ছি, ছি, তাদের অবস্থা এত খারাপ! একখানা শাড়ীও তার বাবা নিজের উপার্জন থেকে কিনতে পারে না?

সে শুনতে পেল তার বাবা বলছেন, "আমি আগামী মাসে মাইনে পেলেই টাকাটা আপনার কাছে গিয়ে দিয়ে আসতাম, আপনি কষ্ট ক'বে কেন এলেন, আমাকে কেন আপনি এভাবে অপরাধী করলেন? কোনোদিন তো আপনাকে আসতে হয়নি।"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "মাঝে মাঝে খেয়াল হয় নিজেই গিয়ে আদায় ক'রে আনি, কোনো একটা উপলক্ষে ঘোরাফেরা করার সুযোগ বানিয়ে নিই এই ভাবে।"

"সামান্য লোক দিয়ে যা হয়, তার জন্য আপনার মতো লোকের এতটা কষ্ট সহ্য করা কিন্তু ঠিক নয়।"

"কষ্ট ক'রেই টাকা উপার্জন করেছি, কষ্ট সহ্য করা অভ্যাস আছে।"

"মাধুরী!"—চিৎকার ক'রে ডাকলেন মাধুরীর বাবা।

মাধুরী তাড়াতাড়ি স'রে গিয়ে দূর থেকে বলল, "যাই বাবা।"

"এক পেয়ালা চা ক'রে আনো।"

ইতিমধ্যে মাধুরী কাছে এসে গিয়েছে। সে শুনতে পেল ভদ্রলোক বলছেন, "চা আমি এখন খাই না।"—ব'লে ভদ্রলোক বেরিয়ে পড়লেন, মাধুরীর বাবাও তাঁকে এগিয়ে দিতে সঙ্গে সঙ্গে চললেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুতের ধাক্কার মতো এক ধাক্কা খেয়ে মাধুরী টলতে টলতে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

যিনি টাকা আদায় করতে এসেছিলেন তিনি মৃত্যুঞ্জয় মিত্র, চপলার বাবা। মাধুরী তাঁকে দেখতে পেয়েছিল।

নয়

মঙ্গলবার সকাল। ক্লাসের ঘণ্টা তখনো বাজেনি। ক্লাস আরম্ভ হওয়ার অনেক আগে থাকতেই মেয়েরা আসতে শুরু করে, বন্ধুদের আলাপ আলোচনার সুবিধে হয়।

চপলা কনক উমা এরা সব পূর্বযুক্তি অনুযায়ী অন্যদিনের চেয়ে কিছু আগেই এসেছে। আজ কমলাকে ওরা সবাই মিলে একটু জব্দ করবে।

মাধুরী সোমবার ক্লাসে আসেনি, আজ আসবে কিনা তারও লক্ষণ নেই। কি হ'ল তার, তা নিয়ে ওরা নানারকম গবেষণা করল। চপলা বলল, "আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।"

কনক আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, "কি সন্দেহ?"

"মাধুরী শনিবারে আমাদের বাড়িতে গিয়ে খেয়েছে, হয়তো সহ্য হয়নি।"

মুখ টিপে হাসতে হাসতে চপলা কথাগুলো বলল।

কনক জিজ্ঞাসা করল, "খুব খেয়েছিল বুঝি?"

"তা একটু বেশি হয়তো হয়েছিল। তা'ছাড়া এই গরমে মিষ্টি খেয়েই রেফ্রিজারেটরের জল খেল এক গ্লাস, বেচারার এসব অভ্যাস নেই কোনো জন্মে।"

উমা বলল, "তা'হলে ঠিক তাই। নইলে হঠাৎ অ্যাবসেণ্ট হওয়ার মেয়ে তো সে নয়।"

সবাই নিশ্চিন্ত হ'ল এ কথা শুনে। মনে মনে মাধুরীর ভাগ্যে কিছু ঈর্ষাও হ'ল কারো কারো মনে, বিশেষ ক'রে কনকের। কারণ অবস্থার দিক দিয়ে যদি ভাব করতে হয়, তা'হলে চপলার সঙ্গে ভাব করার একমাত্র দাবী হচ্ছে কনকের। এটা অবশ্য কনকের নিজের ধারণা। তাই সে মাধুরীর অসুখ হওয়ার কল্পনাতেও মনে মনে খুব খুশি হ'ল, এবং এই অসুখে মাসখানেক অন্তত যাতে সে বিছানা ছেড়ে উঠতে না পারে এ জন্য সে মনে মনে মা কালীর কাছে একটু প্রার্থনা জানাতেও ছাড়ল না। কারণ মাসখানেক অনুপস্থিত থাকলে ইতিমধ্যে সে চপলাকে সম্পূর্ণ দখল ক'রে নিতে পারবে, মাধুরী এসে আর তার কাছে আমল পাবে না।

মাধুরী সম্বন্ধে আলোচনা আর বেশিক্ষণ চলল না, কারণ আজ তারা কমলা সম্বন্ধেই ষড়যন্ত্রটা পাকিয়েছে। কমলার বিদ্যা ফলানো, তার টীচারের ভুল ধরা প্রভৃতি চালিয়াতির মজাটা আজ টের পাইয়ে দেবে ওরা।

কমলা কোন্ বেঞ্চির পাশ দিয়ে কোন্ পথ দিয়ে নিজের আসনে গিয়ে বসে তা ওদের মুখস্থ আছে। দুই সারির

বেঞ্চি ও ডেস্কের মাঝখান দিয়ে যে সরু পথ, সেই পথটি ওরা আগে থাকতেই আরও চেপে দিয়েছে, যাতে কমলাকে রীতিমতো ঠেলতে ঠেলতে এগোতে হয়। এর একটি গভীর উদ্দেশ্য আছে। চপলা ঠিক ক'রে রেখেছে কমলা যখন এই সরু পথ দিয়ে এগোতে থাকবে সেই সময় তাকে—কিন্তু থাক্ সে কথা এখন। চালিয়াতি করার ফল আজ তাকে দেওয়া হবে ভাল ক'রেই।

কমলা ক্লাসে প্রবেশ করতে চপলা, কনক, এরা সব হঠাৎ বেশ গম্ভীর হয়ে গেল, যেন কিছুই হয়নি, যেন কমলাকে তারা দেখেনি, এমনি ভাবখানা।

কমলা দু'সারি বেঞ্চি ও ডেস্কের মধ্যেকার সরু পথ দিয়েই ভিতরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল এবং যেতে যেতে মন্তব্য করল, "বেঞ্চিগুলো এভাবে টেনে রেখেছে কে ?"

বলতে না বলতে তার আঁচলে একটা টান পড়ল, এবং কি হ'ল তা বোঝবার আগেই আঁচলের মাঝখানটা ছিঁড়ে দু'ভাগ হয়ে গেল। দেখা গেল ডেস্কে বেঁধানো একটি কাঁটায় আঁচল বেধে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটেছে।

কি হ'ল কি হ'ল ক'রে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল, একটা হৈ চৈ-এর সৃষ্টি হ'ল ক্লাসের মধ্যে। কমলা আঁচল ধ'রে গম্ভীর ভাবে দেখতে লাগল কতটা ছিঁড়েছে, এবং কেমন ক'রে ছিঁড়েছে।

চপলা বলল, "আমারই দোষ ভাই, কাঁটাটি আমি

কমলা দুসারি বেঞ্চি ও ডেস্কের মধ্যেকার সরু পথ দিয়েই ভিতরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। (পৃ. ৫০)

দেখেছিলাম, কিন্তু একবারে ভুলে গিয়েছি, নইলে অফিসে ব'লে ঠিক করিয়ে নিলেই হ'ত।"

চপলা একটু জোর গলাতেই তার অপরাধ স্বীকার করল। একটি মেয়ে কিন্তু বলল, "কাঁটা ওখানে বিঁধিয়ে রাখা হয়েছে, নইলে এলো কোত্থেকে?"

যে দুঃসাহসী মেয়েটি এ কথা বলল, সে চপলার অনুরক্তও নয়, চপলার সঙ্গে তার কোনো ভাবও নেই। তা'ছাড়া চপলা যে কত বড় ধনীর মেয়ে সে খবরও সে রাখে না।

অন্য দিন হ'লে তার কথায় চপলা চুপ ক'রে থাকত না, তার স্পর্ধার উচিত জবাব দিত, তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিত, কিন্তু আজ তার এই কথাতে চপলার একটু সুবিধাই হ'ল। সে তার কথার প্রতিবাদ করল না। বলল, "কি জানি ভাই, মনে নেই। যাই হোক, আঁচল ছেঁড়াতে আমি সত্যিই দুঃখিত।"

এ যে চপলারই কাজ এবং তাকে জব্দ করবে ব'লেই তার এই ষড়যন্ত্র কমলার আর তা বুঝতে বাকি রইল না। কিন্তু সে কথা প্রকাশ না ক'রে বলল, "তাতে আর কি হয়েছে"— ব'লে এগিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু চপলা তাকে ছাড়ল না। সে তাকে থামিয়ে শাড়ীর অবস্থা দেখল এবং কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ ক'রে বলল, "একটু দাঁড়াও ভাই।"

চপলা তার হাতের ব্যাগ থেকে দশ টাকার একখানা নোট বের ক'রে কমলার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, "একখানা

নতুন শাড়ী কিনে নিও, আমি জানি কিনা—আজকাল শাড়ীর দাম কি ভীষণ বেড়ে গেছে। তোমার লোকসান করব না, রেখে দাও টাকাটা।”

কমলা অবাক হয়ে চপলার দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে নোটখানা নিয়ে নিল এবং কোনো কথা না ব'লে নিজের আসনে গিয়ে বসল।

কি তার মনে হ'ল কিছুই বোঝা গেল না। টাকা পেয়ে কৃতজ্ঞ হ'ল, না অপমান বোধ করল, না দুঃখিত হ'ল, তা তার মুখ দেখে কেউ বুঝতে পারল না। সে কোনো চঞ্চলতাই প্রকাশ করল না, তার চোখমুখের ভাব রোজ যেমন থাকে আজও তেমনি রইল, পাশের মেয়েদের সঙ্গে যেমন ভাবে আলাপ করে তেমনি আলাপ করতে লাগল, এবং টীচার ক্লাসে এলে কোনো পাঠ বুঝিয়ে নেওয়া বা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ভঙ্গিরও কিছু বদল হ'ল না।

এ জন্য চপলা আর তার বন্ধুদের মন যথেষ্ট খুশি না হ'লেও, চপলার উদ্দেশ্য সফল হ'ল। অন্তত সে তাই মনে করল। উদ্দেশ্য দু'ভাবে সফল হ'ল—প্রথমত তার শাড়ী ছিঁড়ে, দ্বিতীয়ত শাড়ীর দাম দিয়ে। চপলার দেওয়া টাকা যে তাকে নিতে হ'ল হাত পেতে—এক ক্লাস মেয়ের সামনে, এটাই চপলার পক্ষে যথেষ্ট মনে হ'ল। সে যেন একটা বড় রকমের যুদ্ধে জয়লাভ করল! খুশি হয়ে উঠল সে মনে মনে।

চপলা দেখল—কমলার মুখে কথা নেই, সে বিনা বাক্য-

ব্যয়ে দশটি টাকা নিয়েছে। গরিব সে, ধনীর কাছে সে এমনি অসহায়। টাকার জোর থাকলে যা খুশি করা যায়, গরিব কোনো কথা বলতে পারে না।

কি চালিয়াত কমলা! টাকাটা এমন অনায়াসে হজম করল? একটু লজ্জা হ'ল না নিতে? এই সব কথা চপলার মনে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। চপলার মনে আগে আসেনি এ সব কথা। কনক চপলাকে এইভাবে কমলার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করল, এবং কিছু সফলও হল। চপলা উত্তেজিত হ'ল।

চপলা কমলার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে, অবস্থাটা কল্পনা করতে লাগল মনে মনে। তাকে যদি কেউ এইভাবে টাকা দিতে চাইত তা হ'লে সে টাকা সে তার মুখের উপর ছুঁড়ে দিত, এবং বলত—অত নবাবী করতে হবে না, টাকা দাওগে টাকার কাঙালকে, চপলা টাকার কাঙাল নয়, ভগবানের আশীর্বাদে তার কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আছে।

এই সব ভেবে কিছু সান্ত্বনা পেতে না পেতেই পরদিন সব ব্যাপারটার মোড় ঘুরে গেল হঠাৎ, অতি সাঙ্ঘাতিক ভাবে।

ঘটনাটা এই ঃ

কমলাকে যেদিন টাকা দেওয়া হয়েছে সেদিন ছুটির পর কমলা বেশ একটু পরে রওনা হয়েছিল। একটি মেয়ের বাড়ি পথের উপরে। সে বাড়ির দোতলা থেকে দেখতে পেল

কমলা এদিক ওদিক চেয়ে দশ টাকার একখানা নোট
তার হাতে গুঁজে দিল। (পৃ. ৫৬)

কমলা ধীরে ধীরে বাড়ি চলেছে। সে কমলার দিকে চেয়ে রইল।

সামনে একটু দূরে এক ভিখারী-পরিবার প'ড়ে ছিল, এ রকম কত পরিবার এতদিন যেখানে সেখানে প'ড়ে প'ড়ে মরেছে। ঐ পরিবারের মেয়েছেলেটি কমলাকে বলল—"মাগো, কিছু খেতে পাইনি মা, একটা পয়সা দিয়ে যাও মা।" কমলা এদিক ওদিক চেয়ে দশ টাকার একখানা নোট তার হাতে গুঁজে দিল। নিশ্চয় সেই নোটখানা, চপলা যেখানা তাকে দিয়েছিল।

স্ত্রীলোকটি হঠাৎ এত টাকা পেয়ে একেবারে গদগদ হয়ে উঠল, কোনো কথা বলতে পারল না, ঝরঝর ক'রে তার দু'চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কমলা কিন্তু টাকাটা দিয়েই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চ'লে গেল।

এ সবই ঊষা তার দোতলার বারান্দা থেকে দেখেছে, বলল।

চপলা এ কথা শুনে প্রথমে বিশ্বাস করল না, কিন্তু ঊষা এমনভাবে বলল যাতে বিশ্বাস না ক'রেও পারা গেল না। চপলা ভিতরে ভিতরে আগুন হয়ে উঠেছিল এ কথা শুনে। এত বড় অপমান সে জীবনে কখনো সহ্য করেনি। সে গম্ভীরভাবে ঊষাকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি যে তাকে দেখেছিলে তা কি কমলা জানত?"

"না। আমার কোথায় বাড়ি তা সে জানে না, উপরেও

তাকায়নি, তা'ছাড়া আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তাকালেও সেখানে সে আমাকে দেখতে পেত না।"

কমলা তা হ'লে কাউকে না জানিয়ে এবং কাউকে সাক্ষী না রেখে টাকাটা গোপনে দান করেছে।

এ রকম দান করার উদ্দেশ্য কি ?

ওদের মধ্যে গবেষণা চলতে লাগল।

কেউ বলল—টাকা পেয়ে যে অপমান সহ্য করেছে, এই ভাবে তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করল বোধ হয়। আর একজনের মতে টাকাটা নেওয়া তার অন্যায় হয়েছে, পরে বুঝতে পেরে এই রকম করেছে।

হয়তো তাই।

কিম্বা বাড়িতে গিয়ে টাকার কথা বলতে লজ্জা হবে, তাইতে টাকাটা কাছে রাখতে সাহস করেনি।

পাওয়ামাত্র ফিরিয়ে দিতে পারত, কিন্তু সাহস হয়নি, চপলার মতো ধনী মেয়েকে সে সামনাসামনি অপমান করতে পারেনি।

অথবা গরিব মেয়ে—দশ টাকার নোট দেখে প্রথমে লোভ সামলাতে পারেনি, তারপরে বুঝেছে এ টাকা রাখা তার অন্যায়।

এই ভাবে সবাই মিলে নানা রকম ব্যাখ্যা ক'রেও পাকা সিদ্ধান্ত কিছু হ'ল না, কিন্তু কমলা মেয়েটি যে সহজ মেয়ে নয়, এ কথায় কারো আর সন্দেহ রইল না।

দশ

মাধুরীকে সবাই প্রায় ভুলে গেছে। এখন ওদের আলোচনা চলছে কমলাকে নিয়ে। কমলাই এখন আর সবার উপরে। কমলা যেন এক মহা রহস্য। সোজা পথে তার ব্যবহার আব চাল-চলনের কোনো মানে করা যায় না, কিন্তু তার রহস্য ভেদ না করলেও তো শান্তি নেই।

এমন সময় সবাইকে বিস্মিত ক'রে মাধুরী এসে হাজির হ'ল ক্লাসে। তার চলার ভঙ্গি নতুন ধরনের, তার চেহারা নতুন, সব যেন তার বদলে গেছে! এলো সে একটি কলের পুতুলের মতো। চেহারায় ক্লান্তির ছাপ, চাহনি উদাস। সে এসে পিছনের একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। কনক তার আগের জায়গাটি দখল ক'রে আছে তাই কনকের ভাবনা হ'ল, সেই জন্যই কি মাধুবী দূরে স'রে গেল?

কিন্তু তার চালচলন দেখে তো তা মনে হয় না। সে এদের কাছে আসতে কোনো আগ্রহই প্রকাশ করল না, চপলার কাছে সেও এক অস্বস্তিকর ব্যাপার হ'ল। কোন্ দিক সে সামলাবে? কমলা তার কাছে হার স্বীকার করতে করতেও কেমন যেন ফস্‌কে গেল। মাধুরীকে দেখেও মনে হয়, সেও কেটে পড়তে চায়।

চপলার কাছে এসব বড়ই অস্বস্তিকর মনে হ'ল। কনক প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ আর জমে না, সে ক্রমেই অন্যমনস্ক

হতে লাগল। এ অবস্থা আবার তার বন্ধুদের কাছে মারাত্মক। কমলার কথা উঠতেই চপলা বলল, "আজ থাক্।"

চপলা এর পর একখানা বই খুলে তার দিকে চেয়ে রইল, অন্য মেয়েরা মনমরা হয়ে চুপ ক'রে গেল।

মাধুরী এসেছে অতি সাধারণ এক শাড়ী প'রে। তার এই ভাবান্তরের কারণ কি হতে পারে, চপলা বুঝতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। বার্ষিক পরীক্ষার আর মাত্র দেড় মাস বাকি, বোধ হয় সেই চিন্তা মাথায় ঢুকেছে।···কিন্তু ক'দিন আগেও যে মেয়ে তার সঙ্গে ভাব করতে এত উৎসাহ দেখিয়েছে, আজ তার হঠাৎ এতখানি পরিবর্তন, চপলার কাছে বড়ই অস্বাভাবিক ব'লে বোধ হ'ল।

টিফিন-পীরিয়ডে চপলা মাধুরীকে জিজ্ঞাসা করল, "তোর কি কোনো অসুখ করেছিল?"

"হ্যাঁ।"

"কি হয়েছিল?"

"এমন কিছু না। একটুখানি জ্বর হয়েছিল।"

"জ্বর? ভেবেছিলাম ভয়ানক কিছু।"

জ্বরের কথা শুনে চপলার ভাল লাগল না। সে আশা করেছিল পেটে ব্যথা বা ঐ জাতীয় কোনো অসুখ, তাহ'লে সবার সামনে মাধুরীকে আরও খানিকটা জব্দ করা যেত।

চপলা বলল, "কিন্তু দুদিনের অসুখে তোর পোশাক এমন বিশ্রী হয়ে গেল কেন বল্ তো ?"

মাধুরী নিজের শাড়ীর দিকে চেয়ে দেখল—সত্যিই শাড়ীখানা আটপৌরে, দু এক জায়গায় ছিঁড়েও গেছে। তা দেখে সে একটু লজ্জিতভাবে বলল, "তাড়াতাড়ি স্কুলে এসেছি, অতটা খেয়াল ছিল না।"

চপলা এ কথায় সন্তুষ্ট হ'ল না। সে কেমন যেন সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগল মাধুরীর কথায়। বলল, "তোর এত দিনের অভ্যাস ফিটফাট হয়ে ক্লাসে আসা, এক দিনের অসুখে সে অভ্যাসটাই ভুলে গেলি ? আসল কথাটা কি বল্ তো ? সিল্কের শাড়ী কি তোর বাবা ফেরত দিয়েছেন নাকি ?"

মাধুরী তার নতুন লাভ করা অভিজ্ঞতায় মনে মনে প্রায় ক্ষেপেই ছিল, চপলার অপমানকর কথায় তার মাথা ঘুরে উঠল। সে বলল, "না, ফেরত দেয়নি, কিন্তু দেওয়া উচিত ছিল। কারণ ও রকম শাড়ী কেনবার মতো অবস্থা আমাদের নয়, আমরা গরিব।"

চপলা ভাবল মাধুরী তাকে ঠাট্টা করছে। তাই সে তাকে একটু খোঁচা দিয়ে বলল, "সে তো বটেই, বড়লোক আর ক'জন আছে আমাদের দেশে! তা সত্যি কথাটা যে এতদিনে বলতে পেরেছিস তাতেই আমি খুশি হয়েছি।"

মাধুরীও কথায় আজ হারবে না। সে বলল, "তোমাকে

খুশি করবার জন্য বলিনি, কথাটা ব'লে আমি নিজেই খুশি হয়েছি।"

"কেন? নিজে খুশি হয়েছিস তার মানে কি?"

মাধুরী বলল, "দামী পোশাক প'রে আসার কোনো মানে হয় না। যতই দামী পর, সংসারে তাব চেয়েও দামী শাড়ী আছে।"

চপলা মুখ বেঁকিয়ে বলল, "তাই নাকি?"

"আমি আমার কথা বলেছি। আমি যতই দামী শাড়ী পরব, তোমার শাড়ীব মতো তা হবে না, আর তুমিও যত দামী শাড়ীই পর, তার চেয়েও দামী শাড়ী আছে। এবং তা পবে, যাদের আরও বেশি টাকা আছে, তারা।"

"তোর নিজের কথাই বল্, অন্যের কথা বলা তোর মুখে শোভা পায় না।"

"যা সত্যি তাই বলছি।"

"বুঝতে পেবেছি আমি। আমাদের বাড়িতে তোকে সেদিন নিয়ে যাওয়াই অন্যায় হয়েছিল। দামী পোশাক দেখে তোর মাথা ঘুরে গেছে।"

মাধুবী নরম সুরেই বলল, "বেশ তো, তুমি যদি তা মনে কর, আমার আপত্তি নেই। আমি যা বুঝেছি তাই বলেছি।"

মাধুরীর কথার সুরে বেশ একটা বিদ্রোহের ভাব। চপলাকে সে যে আর গ্রাহ্য করে না, এ কথাটা চপলার কাছে খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠল। আদুরে অভিমানী চপলা মাধুরীর

এই উদ্ধত ভাবটা সহ্য করতে পারল না, সে হঠাৎ সেখান থেকে স'রে নিজের আসনটিতে গম্ভীরভাবে গিয়ে বসল। বোঝা গেল, চপলা আর মাধুরীর মধ্যেকার বন্ধুত্বের সূতোটি ছিঁড়ে গেল।

এগারো

কমলা যে দশ টাকার নোটখানা ভিখারীদের দান করেছে এ কথাটা ক্লাসের মধ্যে প্রচার হতে দেরি হ'ল না। কেউ কেউ অবাক হ'ল, কেউ কেউ তাকে বোকা মনে করল। কেউ বলল, ওর এত দেমাক কিসের? কেউ মনে মনে খুশি হ'ল এই ভেবে যে, চপলা এতে বেশ জব্দ হয়ে গেছে।

শুধু আনন্দ হ'ল পারুলের। সে বোধ হয় ক্লাসে সবার চেয়ে গরিব। কনক তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদের দুরবস্থা দেখে এসেছিল এবং এসে খুব সরস ভাষায় সবার কাছে গল্প করেছিল, সবাই হাসাহাসি করেছিল তা নিয়ে। এ সব কথা পারুলের মনে বিঁধে আছে। কি কান্নাই কেঁদেছিল সে গোপনে গোপনে! শুধু নিতান্তই গরিব ব'লে কোনো কথাটি বলেনি। সে গরিব, কিন্তু তাতে তার কি দোষ, সে কথাটা তাকে কেউ বুঝিয়ে বলেনি, সে জানতও না। জানলে সে আগে থাকতে হয়তো প্রস্তুত থাকত। এই অকারণ নিষ্ঠুরতা তার হয়তো এতটা লাগত না। ক্লাসে যে তার কেউ

বন্ধু নেই, কারো কাছে তার কোনো দাম নেই, এ কথা সে এক রকম ধ'রেই নিয়েছিল।

ঠিক এই জন্যই যখন সে শুনল কমলা ভিখারীকে দশ টাকা দান করেছে, তখনই সে বুঝতে পারল ক্লাসের অন্ততঃ একটি মেয়ে হৃদয়হীন নয়। সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল কমলার দিকে।

ক্লাসে এ পর্যন্ত সে কাউকে কিছু দিতে দেখেনি, কারো কোনো স্বার্থত্যাগ দেখেনি। সে শুধু দেখেছে কার কি আছে তাই পরস্পরকে দেখানোই নিয়ম।

আজ সে হঠাৎ অনুভব করল কমলা আলাদা, ওদের মতো নয়। সে অতগুলো টাকা ভিখারীকে দান করেছে। তার চোখে কমলা খুব বড় হয়ে দেখা দিল। চপলা যে টাকা কমলাকে দিয়েছিল তার মধ্যে অহঙ্কার ছিল, কিন্তু কমলার দানে অহঙ্কার নেই, সে কাউকে দেখিয়েও দান করেনি। ঘটনাটি পারুলের বড় ভাল লাগল। কমলাকে সে কিছুই বলতে পারল না, কিছুই বলল না, শুধু মনে মনে অনুভব করল কমলাই তার অন্তরঙ্গ বন্ধু—আর কেউ নয়। শুধু তার কাছে ব'সে থাকাটা তার এত ভাল লাগছিল যে কথা বলবার দরকারও তার ছিল না। তার কেবলি মনে হচ্ছিল সে যেন একটা বড় আশ্রয় লাভ করেছে।

একটু পরে মাধুরীও পারুলের পাশে এসে বসল।

আজ পারুলের কি ভাগ্য!

পারুলদের অবস্থা কনক যেদিন ঘটা ক'রে সবিস্তারে বর্ণনা করছিল, সে দিন মাধুরী মনে মনে খুবই দুঃখ পেয়েছিল পারুলের জন্য। কিন্তু চপলার আকর্ষণে পারুলকে সে একটি সান্ত্বনার কথাও বলতে পারেনি। তার সঙ্গে মেশবার জন্য মনে মনে তার কতবার ইচ্ছা হয়েছে, পারেনি। কিন্তু আজ মাধুরীর মন থেকে মিথ্যা মোহ কেটে গেছে, তার ভিতরে একটা মস্ত বড় পরিবর্তন এসেছে, তাই সে খুব সহজেই আজ পারুলের পাশে গিয়ে বসতে পারল এবং ধীরে ধীরে ওর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলল।

পারুল এতদিনে এই প্রথম ক্লাসে ব'সে আত্মীয়তার এমন একটি স্বাদ পেল যা সে আগে কখনো পায়নি। তার কাছে আজ পৃথিবীর রঙ বদলে গেল।

বারো

স্কুলে নতুন টীচার এসেছেন সুজাতা দেবী বি-এ, বি-টি, বাংলা পড়াতে। এর আগে বাংলা পড়াতেন সংস্কৃতের পণ্ডিত।

স্কুলের উন্নতি হচ্ছে। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষ উঠেপড়ে লেগেছেন স্কুলের নিজস্ব একটি বাড়ি করবার জন্য, পুরনো ভাড়া বাড়িতে আর চলছে না। সেজন্য চাঁদা সংগ্রহের কাজও নাকি আরম্ভ হয়েছে। শোনা যাচ্ছে বদান্য দাতাও দু'একজন মিলে গেছে।

নতুন টীচার সুজাতা লাবণ্যময়ী, চোখ দুটি বড় বড়, মুখে বুদ্ধির ছাপ। অথচ সাজপোশাকে কিছুমাত্র মনোযোগ নেই, অতি সাধারণ তাঁতের শাড়ী পরা, গলায় সরু চেন, হাতে সরু দু'গাছা সোনার চুড়ি, চতুর দু' একজন মেয়ের মতে সেও নাকি ব্রোঞ্জের উপর সোনার পাত জড়ানো। পায়ে স্লিপার। সাজসজ্জার দিকে যে মনোযোগ দেওয়ার কিছুমাত্র দরকার আছে এ কথা যেন সুজাতা দেবীর মনেই আসে না। কিন্তু তাঁব কথায়, পড়ানোর ভঙ্গিতে এবং ব্যবহারে এমন একটি সৌন্দর্য আছে যাতে মনে হয় না এতে তাঁব দেহ-সৌন্দর্যেব কিছু হানি হয়েছে। তাঁর মধ্যে একটা উচ্ছলতা আছে, তাঁর কথায় প্রাণের পরিচয় আছে; যে মেয়ে পড়া পারে না, তাকে তিনি ধমকান না, বলেন না যে—তুমি ভুল করেছ; বলেন—আরও একটু ভেবে আরও একটু ভাল ক'রে বলবার চেষ্টা কর। এ রকম চেষ্টা করতে গেলেই তিনি তাকে এমন ভাবে উত্তরটি ব'লে দিতে থাকেন যেন সেটি ঐ মেয়েটিরই নিজের কথা। যেন সে ভাল ভাবে বলতে পারছে না ব'লেই তিনি বলতে সাহায্য করছেন। এতে মেয়েদের উৎসাহ বাড়ে, আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয় না।

সুজাতা এদের ক্লাসে প্রথম এলেন। মেয়েদের মনে তিনি কি ভাব জাগালেন তা প্রথমে বোঝা গেল না। তবে যখন পড়াতে আরম্ভ করলেন তখন তাঁকে সবাই পছন্দ করছে ব'লে মনে হ'ল। শুধু চপলার মনের ভাব একটু আলাদা।

তাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। সে তার পাশে বসা কনককে চুপে চুপে বলল, "দেখেছিস ?"

"কি ?"

"এও তাই।"

"কি ?"

"দেখলেই বুঝতে পারবি।"

কনক কথাটি ঠিকমতো বুঝতে পারল না ব'লেই মনে হ'ল। সে বলল, "কোন্‌টি দেখতে বলছ ?"

"দেখছিস না, এ স্কুলের কেমন যেন একটা ভাব ?"

"কি রকম ?"

"কেমন যেন একটা ছোট নজর সবার!"

"কি বিষয়ে ?"

"সব বিষয়েই। ছেঁড়া শাড়ী পরা না হ'লে এখানে ছাত্রীও কেউ আসে না, টীচারও বেছে বেছে সেই রকম আনা হয়।"

"কিন্তু সুজাতাদি নাকি ভাল টীচাব।"

"ভাল টীচার হ'লে কি আর ভাল শাড়ী পরতে নেই ? ভাল গয়না পরতে নেই ?"

কনক বলল, "ওঁদের মাইনেটাও তো দেখতে হবে। টীচারদের তাই দামী শাড়ী গয়না বাড়াবাড়ি মনে হয় আমার কাছে, তা তুমি ভাই যাই মনে কর।"

"আরে না না, আজকাল এই রকমই হাবভাব, যেন এটা

একটা স্টাইল! যেন এতে কত গৌরব! যেন এঁরা সবাই বিগ্যেসাগর!"

কনক চপলাকে যতই মনে মনে আদর্শ মনে করুক, এই একটি বিষয়ে সে একটু প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হ'ল। তার চোখের সম্মুখে হঠাৎ ভেসে উঠল তার এক দূর-সম্পর্কীয়া দিদির চেহারা। সেই দিদি গরিব, এবং টীচার। কনককে সে কি ভালই না বাসে! চপলার কথায় আজ সে তার সেই দিদির ভিতর দিয়ে বাংলাদেশের সব টীচারেরই চেহারা যেন হঠাৎ দেখতে পেল। তাই সে আর কিছু বলল না। চপলা নিজেই বলতে লাগল, "ও রকম হয় কেন জানিস? ও হচ্ছে একটাকে ঢাকবার জন্য আর একটাকে বাড়িয়ে তোলা। ভাল শাড়ী কেনবার ক্ষমতা নেই, তাই ওটাকে স্টাইল নাম দিলে আর দোষ ধরে কে! আমি হ'লে তো বাবা, মরে যেতাম।"

কনক বলল, "তোমাকে কখনো টীচার হতে হবে না, এই যা সুবিধে তোমার, ভাই।"

ওদের আলোচনায় ক্লাসের অনেকেই বেশ অসুবিধা বোধ করছিল এবং তা সুজাতারও দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি কয়েক সেকেণ্ড পড়ানো বন্ধ ক'রে কৌতূকপূর্ণ দৃষ্টিতে ওদের দিকে একটুক্ষণ চাইতেই ওদের সম্বিৎ ফিরে এলো। হয়তো বা মনে মনে একটুখানি লজ্জিতও হ'ল, কিন্তু ঐ একটুখানির জন্য। এতগুলো মেয়ে ও টীচার স্বয়ং ওদের বিপক্ষে যাওয়াতে কনক

বন্ধুরা যথারীতি বিদায় দিতে এসেছিল, কিন্তু চপলা তাদের দিকে ফিরেও চাইল না। (পৃঃ ৬৯)

অন্তত একটা সান্ত্বনা পেল। তার সেই মুহূর্তে আরও বেশি ক'রে মনে হ'ল—এ সংসারে চপলাই তার একমাত্র বন্ধু।

সুজাতার পড়ানো বন্ধ হ'ল কিছুক্ষণ পরেই। তিনি বললেন, "এই বার তোমাদের একটা রচনা লিখতে দিচ্ছি—লেখ। বিষয়, জনসেবা। এবারে ম্যাটি কে এই রচনাটা

ছিল, তাই আশা করি তোমরাও কিছু লিখতে পারবে এ সম্বন্ধে, কেমন ?"

সবাই রাজি হল।

সুজাতা বললেন, "দু' তিন পাতার বেশি লিখো না, সময় আছে আর আধ ঘণ্টা। লেখা শেষ হ'লে খাতা রেখে যাবে, আমি পরে সব দেখে এ নিয়ে আলোচনা করব এবং খাতা ফিরিয়ে দেব।"

সবাই জনসেবা বিষয়ে রচনা লিখতে লাগল উৎসাহভরে, শুধু চপলা মনে মনে কেমন যেন কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। সবাই যেন চার দিক থেকে তাকে চেপে ধরছে। মন জ্বলতে লাগল তার। লেখায় তার মন ছিল না, তবু কোনো রকমে যা তা খানিকটা লিখল এবং স্কুল ছুটি হতেই গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠল। বন্ধুরা যথারীতি বিদায় দিতে এসেছিল, কিন্তু চপলা তাদের দিকে ফিরেও চাইল না।

তেরো

পরদিন বাংলা ক্লাসে সুজাতা দেবী রচনা লেখা নিয়ে সাধারণ ভাবে কিছু আলোচনা ক'রে শেষে বললেন, "তোমাদের আর আমি দোষ দেব না, বিষয়টা তোমাদের পক্ষে একটু কঠিন। সেই জন্যই খুব কম লিখতে বলেছিলাম। আমি চেয়েছিলাম অল্প কথায় জনসেবা বলতে তোমরা কি বোঝ, তা নিজের ভাষায় নিজের মতো ক'রে লিখবে। কিন্তু

সব খাতাতেই তো দেখছি প্রায় একই কথা। মনে হয় তোমরা কোনো বই থেকে এ বিষয় রচনা প'ড়ে থাকবে। তার মানে অন্য একজন ব্যক্তির রচনার অনুকরণ ক'রে লিখেছ তোমরা। এখন থেকে যদি অন্যের কথা নিজের কথা ব'লে চালাতে থাক, তা হ'লে এর পরে নিজে ভেবে কোনো বিষয়েই লিখতে পারবে না।

"তোমাদের লেখার মধ্যে একটা কথা দেখছি, যা প্রায় সবাই লিখেছ; সেটি হচ্ছে সংসারে দরিদ্র আছে ব'লেই আমরা তাদের উপকার করতে পারি, তাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করতে পারি; ওরা না থাকলে আমরা সে সুযোগ পেতাম না। আমাদের পুণ্য হ'ত না। দয়া করা, সেবা করা, এ সবই পুণ্যের কাজ।

"কার লেখা রচনায় এ সব কথা আছে জানি না, কিন্তু এ সব কথা তিনি না লিখলেই ভাল করতেন। জনসেবার উদ্দেশ্যই এ রকম ভাবলে নষ্ট হয়।"

তারপর একখানা খাতা খুলে বললেন, "একজন লিখেছ, ভগবান সংসারে দরিদ্র সৃষ্টি করেছেন।"

চপলা দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "আমি লিখেছি, কিন্তু আপনি যদি ভগবান না মানেন, তা হ'লে আমি কি করব?"

সুজাতা হেসে বললেন, "মানা না-মানার কথা নয়, চিন্তা করতে শেখো। নিজে নিজে ভাবতে শেখো, আগেই অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাবে কেন?"

চপলা আর তর্ক করতে পারল না, তার ধারণা হ'ল সুজাতাদি ক্লাসের মধ্যে তাকে খেলো করতে চান। তার কারণও সে বুঝতে পারল। তার দামী শাড়ী আর গহনা এ স্কুলে আর চলবে না।

সুজাতা বললেন, "আমি গাল দিচ্ছি না কাউকে, তোমরা আরও একটু ভেবে দেখ, তা হ'লেই বুঝতে পারবে তোমাদের ধারণার মধ্যে কোথায়ও গণ্ডগোল আছে। যে-কোনো ব্যাপারে ভগবানকে টেনে আনার দরকার নেই। ওতে ভগবানকে খাটো করা হয়। যাই হোক, এ বিষয়ে অন্যদিন ভাল ভাবে আলোচনা করা যাবে, আজ আর নয়।"

চপলা বলল, "আজকেই বলুন না?"

"অনেক সময় লাগবে যে! জনসেবা কথাটি তোমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয় মনে হচ্ছে, তার উদ্দেশ্যও ঠিকমতো ধরতে পারনি।"

কনক উঠে বলল, "চপলা যা লিখেছে তার মধ্যে অন্যায়টা কি হয়েছে সেটা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিন। আমরা বুঝতে পারছি না।"

সুজাতা খুব সহজ সুরেই বললেন, "আমার কথা হচ্ছে এই যে তোমরা যেটুকু নিজের বুদ্ধিতে বুঝতে পারবে তাই লিখো। মানুষের সমাজে ধনী নির্ধন আছে, কিন্তু কেন আছে সে আলোচনা অর্থনীতির। আর এ সব ভগবানের ব্যবস্থা কিনা সে আলোচনা দর্শনশাস্ত্রের। তোমরা এর

কোনোটাই এখনো জান না, তাই বলছিলাম—নিজে যা জান, যতদূর সম্ভব তাই লেখাই তো ভাল। তাই নয় কি ?”

কনক বলল, “কেন, ভগবানই তো সব সৃষ্টি করেছেন !”

সুজাতা হেসে বললেন, “সেও তো আমরা কিছুই জানি না, জানবার উপায়ও নেই কিছু। শুধু মেনে নেওয়া হয় মাত্র। সে সব পরে হবে। এখন ইস্কুলের সাধারণ রচনার মধ্যে ও সব কথা আলোচনা না করাই ভাল। ভগবান এই স্কুলও সৃষ্টি করেননি, রচনার বইও সৃষ্টি করেননি।”

কনক চাপা গলায় চপলাকে বলল, “কি সর্বনাশ, সুজাতাদি ভগবানকে উড়িয়ে দিতে চান !”

হঠাৎ কমলা দাঁড়িয়ে উঠল। কোনো কথায় সে বড় একটা থাকে না, তাই সবাই অবাক হয়ে তার দিকে চাইল।

সুজাতা বললেন, “তুমি কিছু বলতে চাও? বল, তোমাদের কথা তোমরা যত বলবে ততই আমার ভাল লাগবে।”

কমলা উৎসাহ পেয়ে বলল, “দরিদ্র সংসারে যারা আছে, তাদের দারিদ্র্য দূর করাই হচ্ছে সমাজের কর্তব্য। এ কাজ করলে মানুষেরই তৃপ্তি হয়। কিন্তু এতে পরকালে পুণ্যলাভ হবে কিনা জানি না; যদি হয়, আর যদি সেই জন্যই পরোপকার করি, তা হলে কোনো বাহাদুরি নেই তাতে। আমার মনে হয় কিছু লাভের জন্য এ সব কাজ করলে মানুষ-হিসাবে বড় কাজ কিছু করা হয় না। লোভে প’ড়ে চুরি

করা, আর লোভে প'ড়ে পরের উপকার করা—দুটোই প্রায় এক। এমনকি লোভে প'ড়ে ভগবানকে ডাকাও ঐ একই ব্যাপার।"

সুজাতা খুশি হয়ে বললেন, "আমিও এই কথাটাই বলতে চেয়েছি এতক্ষণ। আরও কিছু বলবে তুমি ?"

কমলা বলল, "আর আমি কিছু বলব না, কেবল একটি কথার মানে আমি বুঝি না। পুণ্যলাভের কথা।"

কনক হঠাৎ বলল, "তুমি ভালই বুঝতে পার, কিন্তু আজ বোধ হয় পারছ না।"—কনকের ইঙ্গিতটা কমলার সেই দশ টাকার নোট বিলিয়ে দেওয়ার প্রতি।

কমলা অবশ্য এ ইঙ্গিত ধরতে পারল না কিছুই। সে হেসে বলল, "পুণ্যলাভের কথা শুধু আমি বুঝতে পারি না তাই নয়, যারা বলে বুঝতে পারে, তারাও না জেনে বলে।"

কনক তার উত্তরে কমলাকে সোজা বলল, "তার মানে তুমি সবাইকে নিজের মতো নির্বোধ মনে কর।"

সুজাতা বাধা দিয়ে বললেন, "তোমরা ক্লাসের মধ্যে ঝগড়া ক'রো না। যে-কোনো বিষয়েই দু'পক্ষের তর্ক হওয়া ভাল, কিন্তু পড়বার সময় নয়। আজ যথেষ্ট হয়েছে। আমরা ডিবেটিং-এর জন্য আলাদা একটা সময় ঠিক ক'রে নেব, সপ্তাহে একবার অন্তত বিতর্ক সভায় বসব, আগে বিতর্কের বিষয় ঠিক ক'রে নিয়ে। তোমাদের সবারই বেশ বুদ্ধি আছে, বেশ বলতেও পার তোমরা, রচনা লেখার সময় আর বিতর্কের

সময় যদি এমনি ভাবে নিজের বুদ্ধি খরচ কর তা হ'লে তোমাদের সবারই উপকার হবে।"

কমলা খুব বিনীত ভাবে বলল, "আমি যা বলেছি তার জন্য আমি দুঃখিত। কাউকে আঘাত দিয়ে কিছু বলা আমার ইচ্ছা ছিল না, হঠাৎ কেন যেন ঐ রকম হয়ে গেল। আমি বলতে চেয়েছিলাম, পুণ্যলাভের জন্য কিছু করা আমার কাছে খারাপ মনে হয়, কারণ সে পুণ্যের ফল পাওয়া যায় মারা যাবার পরে। মারা যাবার পর কি হবে তা আমরা কিছুই জানি না। ঐ রকম ধারণার মধ্যে কোথায়ও ভুল আছে ব'লে মনে হয়, কিন্তু কি ভুল আছে তা বলতে পারব না। ওটা আমার ধারণা। মনে হয় সাধারণ লোককে ভাল কাজে উৎসাহ দেবার জন্য ঐ রকম বোঝানো হ'ত এককালে। যাই হোক, অন্যের যদি অন্য রকম ধারণা থাকে থাক। তা নিয়ে ঝগড়া করতে চাই না।"

সুজাতা বললেন, "তোমার কথায় আমার এখন মনে হচ্ছে ডিবেটিং-এর বন্দোবস্ত না ক'রে তোমরা সবাই পুণ্যলাভ নিয়েই তবে রচনা লেখ। ম্যাট্রিকেও এমনি একটা রচনা এসেছিল 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য'। তোমরা বাড়ি থেকে লিখে আনবে সবাই। দেখা যাবে কোন্ পক্ষের জোর বেশি। ফুলমার্ক রইল ২৫—প্রত্যেককে মার্ক দেব।"

এ প্রস্তাবে সবাই খুশি হ'ল। বাড়ি থেকে লিখে আনতে হবে শুনেই হয়তো।

এদিকে মাধুরী চপলার মোহ থেকে মুক্ত হয়ে পৃথিবীকে নতুন চোখে দেখতে আরম্ভ করেছে। অন্য দিন হ'লে চপলার কথাতেই সায় দিত, কিন্তু আজ কমলার কথাগুলো তার খুব ভাল লাগল। মাধুরীর মনে ভগবান পুণ্যলাভ প্রভৃতি বিষয়ে যে-সব অস্পষ্ট অথচ নিঃসন্দেহ ধারণা ছিল, সে-সব ধারণা যেন একটা ধাক্কা খেয়ে ভেঙে পড়ল। একটা বিষয় নিয়ে যে নতুন ক'রে ভাবা যায়, সে কথা তার আগে কখনো মনে আসেনি; তাই আজ তার মনটা তাজা হয়ে উঠল। তার মনে হ'ল অনেক কিছুই জানি না এই কথাই সত্যি; যারা বলে জানি, তারা সত্যি কথা বলে না। তারা শোনা কথা মেনে নেয় মাত্র।···আর সত্যিই তো ঈশ্বর কোথায় সে কথা তো স্বামী বিবেকানন্দই ব'লে গেছেন। পাছে লোকে ভুল ক'রে শূন্যের দিকে তাকায়, তাই তিনি বলেছেন মানুষকে সেবা করলেই ঈশ্বরকে সেবা করা হয়। রবীন্দ্রনাথও ঠিক ঐ কথাই বলেছেন আর এক ভাষায়। এ সব কথা সে এতদিন জানত, কিন্তু এ নিয়ে সে কখনো ভাবেনি; আজ কমলার কথা শোনবার পর থেকে সবই তার কাছে এক নতুন অর্থ প্রকাশ করছে। মাধুরী কমলাকে মনে মনে শ্রদ্ধা জানাল।

আর পারুলও কমলার কথার মধ্যে একটি ভরসা পেল, একটা আশ্রয় পেল। যাদের টাকা আছে, তারা কিছু দান ক'রে পুণ্যলাভ করবে ব'লেই ভগবান অনেকগুলো লোককে

গরিব বানিয়েছেন, এ কথার মধ্যে গরিব পারুল কোনো আনন্দ খুঁজে পায়নি। সে আরও লজ্জা পেয়েছে, আরও আঘাত পেয়েছে। কিন্তু যে মুহূর্তে সে শুনতে পেল, না, সে কথা ঠিক নয়, ভগবান গরিব সৃষ্টি করেননি—গরিব মানুষই সৃষ্টি করেছে, এবং মানুষেরই কাজ তাদের অবস্থার উন্নতি করা, সেই মুহূর্তে হঠাৎ তার মন একটা নতুন আলোয় ভ'রে উঠল। সে বুঝতে পারল, গরিবের দুঃখের অবস্থা চিরস্থির নয়, এই মানুষই ইচ্ছে করলে তাকে সুখী করতে পারে। তাই পারুলের দারিদ্র্যও হয়তো একদিন ঘুচবে। আর ঐ কমলার মতোই কোনো মেয়ে—যে গোপনে দান করে, কাউকে দেখাবার জন্য নয়, পুণ্যলাভের আশায় নয়—তার দুঃখ দূর করবে।

পারুল ভাবছে এই সব কথা, আর তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।···কিন্তু এ তো স্বপ্ন মাত্র। তার ধারণা, কমলা তার দুঃখ ঘোচাবে। কিন্তু কেমন ক'রে সে পারবে? সেও হয়তো তারই মতো গরিব। গরিব না হ'লে সে গরিবের পোশাকে স্কুলে আসবে কেন। গরিব নয় সে বুদ্ধিতে, হয়তো মনটাও তার গরিব নয়—তাই আর সব গরিবের চেয়ে সে আলাদা, তাই সে কাউকে গ্রাহ্যই করে না। টাকা পয়সায় তার লোভ নেই। নিজের সম্মান নষ্ট ক'রে সে বড়লোকের দয়ার দান নেয় না, তা সে বিলিয়ে দেয় অন্যকে। তার এই মনের জোরের কাছে আর সবাই অকারণ ছোট হয়ে যায়, সবাই কেমন যেন ভয় পায়। গরিব যে তার এইটুকুই তো

সম্বল। পারুলও আর নিজেকে ছোট মনে করবে না শস্তা শাড়ীর জন্য।

আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটল পারুলের মনে! ক্লাসের এক রচনাকে উপলক্ষ ক'রে যে এমন ঘটতে পারে তা কি কেউ ভাবতে পেরেছিল?

চৌদ্দ

শুধু পারুল নয়, ক্লাসের আরও অনেকেরই মনোজগতে কেমন একটা ওলটপালট ঘ'টে গেল। আশ্চর্য সুজাতার পড়ানোর ভঙ্গি! তিনি একদিন ক্লাসে এসেই এতগুলো মেয়েকে নতুন ক'রে ভাবাতে শেখালেন। এতদিনের রচনালেখার রীতিকে তিনি উল্টে দিলেন। মেয়েরা রচনার বই থেকে মুখস্থ করত, এবং একজন লেখক যা লিখেছেন, ভাল হোক মন্দ হোক, সবাই তাই মুখস্থ ক'রে লিখত। মেয়েরা নিজে কিছুই চিন্তা করতে পারত না। কিন্তু এই প্রথম তাদের মনে হ'ল, বইতে ছাপা রচনাই একমাত্র সত্য নয়। সুজাতা মেয়েদের মনে স্বাধীন ভাবে ভাববার ক্ষমতা জাগিয়ে দিলেন। এবং তাঁর অজ্ঞাতসারে আর এক দিক দিয়ে তিনি মাধুরী আর পারুলের একটি বড় উপকার করলেন। কি সে উপকার আমরা তা দেখেছি। তা ভিন্ন মাধুরী চপলার কাছ থেকে দূরে গিয়ে নিজের একটা আলাদা মত গ'ড়ে তোলার চেষ্টা করছিল, সব

বিষয়েই সে চপলার উল্টো হবে এই ছিল তার সঙ্কল্প। সে সঙ্কল্প বজায় রাখার জোর পেল সে সুজাতার কথায়।

আর পারুল এক মুহূর্তে নিজের সমস্ত অপমান ও হীনতা ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠে এলো, তার যেন নতুন ক'রে জন্মলাভ হ'ল, তার চোখে পৃথিবীটা সুন্দর হয়ে দেখা দিল।

পারুল পরদিন স্কুলে এলো উজ্জ্বল মুখে। তার চালচলনে আর কোনো জড়তা নেই। সে আজ খুব সহজভাবে কমলার সঙ্গে কথা কইতে লাগল।

কমলা জানত, পারুল খুবই গরিব। সে জন্য পারুলের সঙ্গে তার ব্যবহার ছিল স্নেহপূর্ণ। আর সে জন্য পারুলের মন কৃতজ্ঞতায় ভ'রে ছিল। কিন্তু তবু সে কমলার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে সাহস করত না। তার দশ টাকার নোট দান করার কথাটা পারুলের সব সময় মনে জেগে থাকত, কারণ সেই দানের কথা শুনেই সে কমলাকে এত বড় মনে করেছে।

সে জন্য পাছে অন্তরঙ্গতা করতে গেলে কমলা তার মনের ভিতরটা দেখে ফেলে, পাছে সে মনে ভাবে পারুল বোধ হয় তার কাছে কোনো উপকার পাবে আশা ক'রে আছে, সে জন্য পারুল খুব মন-মরা হয়ে থাকত। কিন্তু আজ সে ভাব তার কেটে গেছে। সে কমলার মুখের দিকে চেয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু হঠাৎ কথা ফুটল না। কমলা তা বুঝতে পেরে বলল, "কিছু বলবে পারুল?"

পারুলের মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। সে কাঁপা গলায় বলল, "না, থাক্, পরে বলব।"

কমলা পারুলের হাতখানা সস্নেহে নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধ'রে রাখল। পারুলের হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফাতে লাগল আনন্দের উত্তেজনায়। পরে খুব খানিকটা সাহস সঞ্চয় ক'রে এক নিঃশ্বাসে বলল, "তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে।"

কমলা পারুলের দিকে চাইল, পারুল লজ্জায় মাথা নিচু কবল।

কমলা খুব সহৃদয়তার সঙ্গে বলল, "অনেক দিন থেকেই ভাবছিলাম কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করি, কিন্তু কেউ আমাকে পছন্দই করে না।"

পারুল বলল, "আমি করি। তোমাকে আমার খুব—খুব ভাল লাগে।"

কমলা হেসে বলল, "বন্ধুত্ব করলে কিন্তু খাওয়াতে হয়, তোমাদের বাড়িতে আমি কাল গিয়ে খাব, বুঝলে? কাল ববিবার—তুপুরে।"

পারুলের চোখে জল এসে গেল আনন্দে। বলল, "সত্যিই যাবে ভাই?—গেলে আমার খুব ভাল লাগবে।"

পারুল বাড়িতে গিয়ে তার মাকে সব বলল। এত গরিব তারা, তবু পারুলের বন্ধু এসে খাবে শুনে পারুলের মা

যথাসাধ্য আয়োজন করতে লাগলেন। পাশের পরিচিত বাড়ি থেকে বাসন চেয়ে আনলেন এক দিনের জন্য।

কমলা এসে পারুলদের বাড়িতে আনন্দের উচ্ছ্বাস বইয়ে দিল। পারুলের মাকে মা বলে ডেকে প্রথমেই সে এমন আত্মীয় হয়ে পড়ল যে, দরিদ্র ব'লে ওদের কারো আর কোনো লজ্জা রইল না। সে নিজ হাতে পারুলের মাকে রান্নায় সাহায্য করতে লাগল। তরকারী কুটে বাসনপত্র এগিয়ে দিল, জল ঢেলে দিল। পারুলের ভাইটিকে কোলে নিয়ে কত আদর করতে লাগল। পারুলের ছেঁড়া বিছানায় অনায়াসে গিয়ে শুয়ে প'ড়ে পারুলের ছোট্ট বোনটিকে গল্প শোনাতে লাগল।

তারপর খেতে ব'সে কি প্রশংসা! যা মুখে দেয় তাই অতি সুন্দর। সবই চেয়ে চেয়ে খেলো। খাওয়া শেষে পারুলকে ডেকে বলল, "আমাদের বন্ধুত্ব কিন্তু পাকা হ'ল।"

আসবার সময় হাতে একটা প্যাকেট এনেছিল, সেইটি এবারে পারুলকে দিয়ে বলল, "এটা বন্ধুত্বের চিহ্ন, রেখে দাও।"

"কি আছে ওতে?"

"খুলে দেখ।"

পারুল প্যাকেট খুলে চমকে গেল।—দু'খানা শাড়ী—দুটো ব্লাউজ! কমলা কি এগুলো তাকে দিচ্ছে?

কমলা বলল, "এগুলো তোমারই জন্য এনেছি ভাই।

আমার ছিল, কখনো পরিনি। অনেক দিন ধ'রেই ভাবছিলাম কাউকে উপহার দেব।"

পারুলের পক্ষে এতখানি সহ্য করা অসম্ভব। সে কোনো দিন কারো কাছে এত স্নেহ পায়নি। মানুষ যে এত ভালবাসতে পারে তাও তার জানা ছিল না।

পারুলের চোখে জল এলো। সে কমলার হাত ধ'রে বলল, "তুমি কেন এসব আমাকে দিচ্ছ, তোমার জিনিস, দরকার হ'লে তুমিই বা পাবে কোথায়? তোমার অবস্থা কেমন জানি না, কিন্তু তুমি ছেঁড়া শাড়ী প'রে ক্লাসে এসে থাক—" আর বলতে পারল না পারুল, অতি-আবেগে গলা তার ধ'রে এলো।

কমলা বেশ গার্জিয়ানি ভঙ্গিতে বলল, "ও সব বাজে কথা রাখ, উপহার দেওয়া জিনিস খুশি মনে নিতে হয়। তুমি না নিলে আমি ভীষণ রাগ করব।"

"না না, তুমি রাগ ক'রো না, তুমি যদি খুশি হও, তা হ'লে নেব।"

কমলা চ'লে যেতেই পারুল তার মাকে ডেকে সব দেখাল। পারুলের মায়ের চোখ দুটোও আনন্দে ছলছল ক'রে উঠল। মেয়েকে আদর করতে করতে বললেন, "তোর ভাগ্য বড় ভাল রে, তোর ভাগ্য বড় ভাল।"

পারুল রাত্রে শুয়ে শুয়ে কেবলই কমলার কথা ভাবতে লাগল। অকারণ তার দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে

লাগল। তারপর খানিকটা কেঁদেকেটে সৌভাগ্যের বোঝাটা হাল্কা ক'রে ফেলল অনেকখানি। তার মনে হ'ল কমলা এক আশ্চর্য মেয়ে! দশ টাকার নোট বিলিয়ে দেওয়ার কথা তার মনে পড়ল। তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখল তার এই ব্যবহারটা। এখানেও সে নিজেকে বঞ্চিত ক'রে শাড়ী ও ব্লাউজ বিলিয়ে দিল। পারুলের বুদ্ধি খুব পাকা নয়, তবু সে নিজের মতো ক'রে একটা কিছু বুঝে নিল কমলার সম্বন্ধে। কারো কোনো জিনিস আছে শুধু তার জন্যই কি সে সত্যিই বড় হয়? এ রকম যে ভাবে, সে খুব বড় লোক হতে পারে, কিন্তু তার দিকে মন টানে না কেন? চপলার তো অনেক আছে, কিন্তু তাকে অনেক বড় মনে হয় না কেন? তাকে ভালবাসা যায় না কেন?

পারুলের মনে আজ অনেক প্রশ্ন। হঠাৎ তার যেন দৃষ্টি খুলে গেছে। সে যেন আজ এই প্রথম অনেক জিনিস নতুন ক'রে আবিষ্কার করছে। তার মন আজ আনন্দে ভ'রে উঠেছে, যেন শরৎ কালের সোনালি রোদের মতো ভ'রে উঠেছে, যেন বর্ষার নদীর মতো ভ'রে ওঠে। দুকূল ছাপিয়ে গেল যে!

পারুলের মনে হল কমলা তার বাড়তি জিনিস যেটুকুই অন্যকে দিয়েছে সেইটুকুতেই সে অনেক বড়। দেওয়াটাই পরিচয়। বইতে পড়েছিল, নদী নিজেকে দেয় বলেই সে এত বড়। কথাটার মানে আজ তার কাছে আপনা থেকেই

পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠল। সে বুঝতে পারল লোভী মানুষ, ছোট মানুষ। তার কোটি কোটি টাকা থাকলেও সে ছোট। আর যার দশটি টাকা আছে এবং সেই দশটি টাকা সে অনায়াসে ছাড়তে পারে, সে কোটি টাকার লোকের চাইতে বড়। কমলা যে সামান্য দুটি জিনিস দুজনকে দিয়েছে শুধু এই জন্যই তাকে এত ভালবাসতে ইচ্ছে হয় কেন! এ কি এক অদ্ভুত আকর্ষণ! চপলার কথা মনে হলেই সে যেন দূরে ঠেলে দেয়। কিন্তু কমলা! কি সুন্দর তার নামটি, কি সুন্দর তার ব্যবহারটি! এমন মানুষ সবাই হয় না কেন? তা হ'লে তো সবাই সুখী হতে পারত।

পারুল বুঝতে পারল, কমলা ধনী হোক গরিব হোক তাতে কমলার কিছুই এসে-যায় না। সে টাকা পয়সা শাড়ী গয়নার অনেক উপরে। তার মনটাই সব চেয়ে বড়। এত বড় যে চপলার টাকা তাকে ছুঁতে পারে না, তার নাগাল পায় না।

পনেরো

সেদিন ক্লাসে পুণ্যলাভ নিয়ে রচনা লিখতে দিয়েছিলেন সুজাতা। তিনি সবার রচনাই প'ড়ে দেখেছেন। পুণ্যলাভের ইচ্ছা থেকে কাজ করার বিরুদ্ধে লিখেছে কমলা, পারুল আর মাধুরী। আর, কি কি কাজ করলে পুণ্যলাভ হয় তার তালিকা দিয়ে রচনা পুষ্ট করেছে অন্য সবাই।

সুজাতা ভেবে দেখলেন বিষয়টা স্কুলের মেয়েদের পক্ষে বড়ই কঠিন। সেদিন কথায় কথায় পুণ্যের কথা এসে পড়েছিল, এবং ঝগড়া থামানোর জন্যই তিনি শেষে এই উপায় অবলম্বন করেছিলেন। একমাত্র কমলাই কিছু যুক্তির কথা বলেছিল। পারুল আর মাধুরীও নতুন ক'রে ভাবতে শিখেছে। কিন্তু তবু এ নিয়ে হঠাৎ কিছু আলোচনা না করাই ভাল। তাই সুজাতা একটা কৌশল কবলেন। তিনি বললেন, "রচনা নিয়ে ক্লাসে আজ আর আলোচনা করা হবে না। আজ একটা গল্প শোন।

"একটা লোক ছিল শহরে। তার ব্যবহারটা ছিল খুব ভাল। মনটা আরও ভাল। বিপদে-আপদে সবারই সে প্রাণপণ উপকার করত। কারো অসুখ করলে সারারাত জেগে তাকে শুশ্রূষা করত, কলেরা-রোগী বসন্ত-রোগী সবাইকে সে সমান শুশ্রূষা করত। কেউ কঠিন কোনো অসুখে পড়েছে শুনলেই সে ছুটে যেত তার কাছে। এই লোকটিকে তোমাদের কেমন মনে হয়?"

সবাই বলল, "খুব ভাল লোক।"

সুজাতা বললেন, "এই লোকটি রোগীর শুশ্রূষা করতে গিয়ে প্রত্যেক বাড়ি থেকেই কিছু না কিছু চুরি করত এবং চুরি করবে ব'লেই লোকের সেবা করতে তার এত আগ্রহ ছিল। এখন, এই লোকটাকে তোমরা প্রশংসা করবে, না নিন্দা করবে?"

সবাই এক সঙ্গে ব'লে উঠল, "নিন্দা করব।"

সুজাতা বললেন, "কেন? লোকটা পরের উপকার করে, জনসেবা করে।"

কনক বলল, "কিন্তু নিঃস্বার্থ উপকার নয়।"

সুজাতা বললেন, "ঠিকই বলেছ। উপকার করতে গিয়ে কিছু লাভ করব এই লোভে যে উপকার করে তাকে আমরা প্রশংসা করি না।"

চপলা সুজাতার এই গল্পটির ইঙ্গিত এতক্ষণে বুঝতে পেরে ব'লে উঠল, "আমি বুঝেছি আপনি কি বলতে চান।"

"কি বুঝেছ, বল।"

"আপনি, যে-লোকটা পুণ্য হবে ব'লে গরিবকে দান করে, তার সঙ্গে এর তুলনা করছেন। কিন্তু এ তুলনা আমি মানি না। দুজনের পরোপকার এক নয়। একজন চুরি করছে, আর একজন কারো কিছু চুরি করছে না।"

সুজাতা বললেন, "দুজনের তফাতটা তুমি ঠিকই ধরেছ, তফাত না থাকলে এই গল্পটা করবার কোনো দরকারই হ'ত না। দুজনের সৎকাজের চেহারা যদি সম্পূর্ণ এক হ'ত তা হ'লে এ প্রসঙ্গ তুলতামই না। কিন্তু তবু যদি ভেবে দেখ তা হ'লে স্বীকার করতেই হবে যে দুজনেই কিছু লাভের আশায় সৎকাজ করছে। পার অস্বীকার করতে এ কথা?"

চপলা এ কথার কোনো উত্তর দিতে পারল না।

কনক বলল, "অস্বীকার করতে না পারলেই চপলার কথা

মিথ্যা হ'ল কি ক'রে ? একটুখানি লোভ বা স্বার্থ থাকলে ক্ষতি কি ? পরের উপকার তো সে ঠিকই করছে। তাই বা ক জন করে ? আপনি একটুখানি খুঁতকে এতখানি বাড়াচ্ছেন কেন ? সবাই কিছু পাবে আশাতেই তো সব কিছু করে। চপলা খুব মিথ্যা বলে নি।"

সুজাতা মনে মনে বিরক্ত হ'লেও তা প্রকাশ না ক'রে বললেন, "তোমরা যদি একটা জিনিসকে নতুন ভাবে দেখতে ভয় পাও তা হ'লে এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ক'রে লাভ নেই। কারো বিশ্বাসের উপর আমি হাত দিচ্ছি না, কিন্তু কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে হ'লে সে বিষয়টিকে যত দিক থেকে দেখা সম্ভব তা দেখা উচিত। তা যদি না দেখতে চাও, তা হ'লে এ বিষয়টি আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া হোক।"

চপলা সুজাতার এই নরম সুর দেখে আরও সাহস পেল। সে রীতিমতো জোরের সঙ্গে বলল, "এ বিষয়ে আপনি আর আমাদের কিছু বলবেন না, বিষয়টি আলোচনা থেকে বাদ দেওয়াই ভাল।"

সুজাতা খুব দুঃখিত হলেন চপলার কথায়। তিনি আরও কোমল সুরে বললেন, "তোমরা সবাই যদি বল, তা হ'লে এ ধরনের কোনো আলোচনাই করব না।"

মাধুরী কমলা পারুল, এরা এতক্ষণে চুপ ক'রে ছিল; চপলা ও কনকের উদ্ধত ব্যবহারে তারা মনে মনে খুবই দুঃখ

পাচ্ছিল, লজ্জাও পাচ্ছিল খুব। সুজাতার কথায় এবারে তারা আর চুপ ক'রে থাকতে পারল না। কমলা বলল, "আমরা শুনব আপনার আলোচনা, আপনি আলোচনা বন্ধ করতে পারবেন না।"

সুজাতা মনে মনে খুশি হয়ে বললেন, "ওদের অসুবিধে হবে, আজ থাক। ভবিষ্যতে যদি কোনো বিষয়ে আলোচনা করি তবে আগে জানিয়ে দেব, যারা আলোচনা পছন্দ কর না তারা উপস্থিত না থাকলেই হ'ল।"

মাধুরী বলল, "সেই ভাল। আমরা ক্লাসের শেষে আলাদা ভাবে আপনার কাছে পড়ব এবং আপনার উপদেশ শুনব।" আরও অনেক মেয়ে এ কথায় সায় দিল।

পারুলের মুখে কোনো কথা নেই। কমলা যা ভাল মনে করে, তার পক্ষে তাই ভাল। কমলার সম্মান রক্ষার জন্য সে সব কিছু করতে প্রস্তুত। তাছাড়া তার বিশ্বাস কমলার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে ক্লাসে আর নেই। তার মতো মনও কারো নয়। অতএব সে যা করে ভাল হ'তে বাধ্য।

সুজাতা আলোচনার শেষে ক্লাস থেকে চ'লে গেলে চপলা মুখর হয়ে উঠল। সে তার ভক্তদের ডেকে দল পাকাতে লাগল।

ষোল

যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতা শহরে জাপানী বোমা পড়বার পর থেকে স্কুলের অবস্থা হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে পড়ল। স্কুলের জন্য যে বড় বাড়ির স্বপ্ন দেখা হচ্ছিল তাও ভেঙে গেল।

সবাই তখন শহর থেকে পালাচ্ছে, তখন স্কুলের কথা কে ভাবে! কিন্তু ভাবতে হ'ল আবার। শহর ছেড়ে যেমন সবাই পালিয়েছিল, তেমনি তার তিনগুণ ফিরে এলো আবার শহরেই। বড় বড় বাড়ি সব খালি প'ড়ে ছিল, এখন একখানা ঘর ভাড়া পাওয়া যায় না। এক দিকে পথে শুয়ে শুয়ে লোক মরছে, অন্য দিকে ঘরে দম বন্ধ হয়ে লোকে আধমরা হচ্ছে। স্কুলের ক্লাসগুলোতেও তাই। অতিরিক্ত ভিড়।

নতুন বাড়ি না হ'লেই চলে না এমন অবস্থা। স্কুলের কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের কাছেই সাহায্যের জন্য আবেদন পাঠিয়েছেন, যদি কেউ নতুন বাড়ির জন্য কিছু দান করেন এই আশায়।

ইতিমধ্যে ক্লাস নাইন-এর মেয়েরা ক্লাস টেন-এ উঠেছে। চপলাও প্রোমোশন পেয়েছে। কোনো রকমে পাস-মার্ক রেখেছিল। প্রশ্ন ছিল জলের মতো।

যুদ্ধের বাজারে চপলার সাজসজ্জা আরও জমকালো হয়ে উঠেছে। ক্লাসের দলাদলিটাও বেশ পেকেছে। অবশ্য

কমলা কোনো দলেই নেই, কিন্তু তার অনুরক্ত যারা তাদের সঙ্গে চপলার ভক্তরা ভাল মেশে না, এরা ওদের ছোট নজরে দেখে। চপলাদের হিংসের আরও কারণ বার্ষিক পরীক্ষায় কমলা প্রথম হয়েছে অনেক বেশি মার্ক পেয়ে। মাধুরী পারুল এরাও তার পর পরই আছে। এদিক দিয়ে চপলার দলের অবস্থা খুবই খারাপ। তারা কোনো রকমে উতরে গেছে। কেউ বা এক বিষয়ে, কেউ বা দুই বিষয়ে ফেল, প্রোমোশন পেয়েছে যদিও।

ক্লাসের নতুন মেয়ে এসে জুটেছে অনেক, পুরনোদের মধ্যে দু' একজনকে আর দেখা যাচ্ছে না প্রোমোশন পাওয়া সত্ত্বেও। ' শোনা যাচ্ছে তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। এ রকম হয়ে থাকে সব মেয়ে-স্কুলেই। একটু লেখাপড়া না শিখলে বিয়ে হবে না ব'লেই অনেক মেয়ে স্কুলে পড়তে আসে।

চপলারও বিয়ের কথাবার্তা চলছে, গুজব রটেছে ক্লাসে। এ জন্য অহঙ্কার তার যেন একটু বেড়েছে। ধনী হওয়ার এই সুবিধে, পড়াশোনা তাদের তো দরকার নেই বেশি, কিছু শেখা হ'লেই বিয়ে হতে দেরি হয় না।

গরিব মেয়েদেরও ঐ একই যুক্তি।

এদিকে নতুন স্কুল-বাড়ির জন্য আবার আশা জেগে উঠেছে, শোনা যাচ্ছে বদান্য লোক কয়েকজন এগিয়ে এসেছেন। হাজার পঁচিশেক টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে—সবাই বলছে।

কিন্তু আশা জেগেছে কাদের মনে?

আর যাদের হোক, চপলার নয়। কারণ সে জানে পরীক্ষার অনেক আগেই তাকে এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। আর তা না হলেও নতুন বাড়ি তৈরি হবে সে কবে?

অত দূর ভবিষ্যতের ভাবনা চপলা করে না। নেহাৎ বাধ্য হয়ে সে এই গরিব স্কুলে পড়তে এসেছে, দুদিন পরেই এখান থেকে সে চলে যাবে, এখানকার কথা তার মনেও পড়বে না।

চপলা কনককে ডেকে বলল, "শুনেছিস এই ছোটলোকি-পনার স্কুলটার না কি আবার জৌলুষ ফিরবে। তিন কাল গিয়ে চার কালে ঠেকেছে, মরতে বসেছে, তার উপর আবার রং মাখা, কলপ লাগানো। হাসি পায় রে বাবা!"

কনক বলল, "না, তা নয়, স্কুলের নতুন বাড়ি হবে, এখানে আর স্কুল থাকবে না।"

"তুই ঐ সব কথা বিশ্বাস করিস? নতুন বাড়ি করা সোজা কথা? কে অত টাকা দেবে? বাবা ইচ্ছে করলে করতে পারত বটে, কিন্তু লাভ কি? আমি তো আর সে নতুন স্কুলে পড়তে আসব না, তবে আর আমাদের মাথাব্যথা কেন! তুইও যেমন, ভেবে দেখ না কথাটা? আমরা যদি সে স্কুলে না পড়ি তা হ'লে নতুন বাড়ি হ'লে আমাদের কি?"

কনক বলল, "সে কথা ঠিক, তবু নতুন বাড়ি হ'লে আমাদের এই স্কুলেরই নাম থাকবে তো, পরে আমাদের এ কথা ভাবতে ভাল লাগবে। তাই না?"

কিন্তু চপলা কনককে দমিয়ে দিল। বলল, "এমন স্কুলের কথা মনে রাখবি, বলিস কি? আমি তো এর সীমা যেদিন পার হব সেই দিনই ভুলে যাব। ভুলে যাব যে একপাল ছোটলোকের সঙ্গে এখানে পড়েছি, একপাল ছোটলোক টীচারের কাছে এখানে পড়েছি।"

কনক আর প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না।

চপলা সেদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে দেখে তার বাবার মনটা বড়ই বিষণ্ন। মাকেও যেন কেমন মনমরা দেখাচ্ছে। তার বাবা পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছেন বারান্দায়।

চপলার বুকের মধ্যে যেন ধাক্কা লাগল একটা। বিয়ে ভেঙে গেল নাকি? মাকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি হ'ল তোমাদের—বাবাকে ও রকম চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?"

তার মা বললেন, "তোদের স্কুলে হাজার দুই টাকা দিতে হ'ল এ সময়। এদিকে বিয়ের খরচ—স্কুলে ঐ টাকাটা না দিলে নাকি মান থাকে না।"

চপলা তো শুনে মহা খুশি। সে ভেবেছিল কি না কি। গরিব স্কুলে তার বাবা দু'হাজার টাকা দান করেছেন, এ তো খুব ভাল কথা, মনের মতো কথা। আর এই কল্পনাটাই তো সে এতক্ষণ করছিল। ভাবছিল তার বাবা যদি এ স্কুলে কিছু দান করে তা হ'লে টীচারদের কাছে তার দাম আরও বেড়ে যাবে, আর এতে ছাত্রীদের কাছেও তার

হেড মিস্ট্রেস বললেন, "আমি অত্যন্ত আনন্দ এবং গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে"—(পৃ. ৯৩)

সম্মান বেড়ে যাবে কত। সবাই বুঝতে পারবে চপলারা কত বড়লোক। তাই সে গদ গদ ভাবে তার মাকে বলল, "তা ভাববার কি আছে? এ তো খুব ভালই হয়েছে মা, খুব ভাল হয়েছে। দু'হাজার টাকা পেলে স্কুল বেঁচে যাবে, বাবার কাছে দু'হাজার টাকা তো দু' টাকার সমান। আরও বেশি দিল না কেন ভাবছি।"...

স্কুলে খুব উত্তেজনা। নতুন বাড়ি হবে স্কুলের। এই আলোহাওয়াহীন বাড়ি থেকে সবাই নতুন বাড়িতে যাবে ভেবে ভারি খুশি। কিন্তু সে নতুন বাড়ি যে কোথায় কত দূরে হবে তা নিয়ে কারো ভাবনা নেই।

সেক্রেটারি এসেছেন স্কুলে। এসে একটি খবর শুনিয়েছেন হেড মিস্ট্রেসকে। হেড মিস্ট্রেস স্কুল ছুটি হওয়ার একটুখানি আগে মেয়েদের সবাইকে ক্লাসের বাইরে দাঁড়াতে বললেন। তিনি আজ একটি সুখবর শোনাবেন সবাইকে। অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীরাও দাঁড়িয়ে গেলেন বারান্দায়।

হেড মিস্ট্রেস বললেন, "আমরা অনেক দিন অনেক দুঃখ স'য়েও স্কুলটিকে কোনোরকমে বাঁচিয়ে এসেছি। ছাত্রীরা শিক্ষয়িত্রীরা অনেক অসুবিধে সহ্য করেছে এই ছোট্ট বাড়িতে। আর চলে না এভাবে। এইবার মনে হচ্ছে আমাদের দুঃখের দিন কেটে যাবে।

"আমি অত্যন্ত আনন্দ এবং গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমরা এই স্কুলেরই তিনজন মেয়ের বদান্য অভিভাবকের

কাছ থেকে আশাতীত দান পেয়েছি, তা দিয়ে আমরা অনেকখানি অস্থবিধে দূর করতে পারব ব'লে আশা করছি। এই স্থখবরটি তোমাদেরই তো আগে শোনা উচিত, কারণ এ তোমাদেরই নিজের স্কুল, তাই তোমাদের কাছেই প্রথম বলছি। আমাদের ক্লাস টেন-এর মেয়ে শ্রীমতী চপলা মিত্রের পিতা শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মিত্র আমাদের স্কুলে দু'হাজার টাকা দান করেছেন। এই মহৎ দানে আমরা কৃতজ্ঞ।"

মেয়েদের মধ্যে একটা আনন্দগুঞ্জন উঠল। সবাই চপলার গর্বিত মুখের দিকে চাইতে লাগল।

হেড মিস্ট্রেস ঘোষণা করলেন—"তারপর ক্লাস এইট-এর মেয়ে শ্রীমতী প্রতিভা চক্রবর্তীর পিতা নারায়ণ চক্রবর্তীর আর একটি মহৎ দান—তিন হাজার টাকা।"

আবার সবার মধ্যে একটা কোলাহল জেগে উঠল। প্রতিভার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল কিন্তু লজ্জায় নত।

হেড মিস্ট্রেস বলতে লাগলেন, "সবচেয়ে বড় দান পেয়েছি আমরা ক্লাস টেন-এর শ্রীমতী কমলা চৌধুরীর পিতা ভবেন্দ্র চৌধুরীর কাছ থেকে—কুড়ি হাজার টাকা।"

হঠাৎ বজ্রপাত হ'লে যেমন হয়—মেয়েদের মধ্যে তেমনি অবস্থা হ'ল। সবাই যেন সকল গায়ে চমকে উঠল। অসম্ভব ব্যাপার। কমলার বাবা—কুড়ি হাজার!

মাধুরী পারুল প্রথমে স্তম্ভিত, তারপর কমলাকে গদগদভাবে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে দেখে সে কখন ওখান থেকে

পালিয়ে গেছে। ধরতে হ'ল তাদের চপলাকে। সে মাথা ঘুরে প'ড়ে গেছে ওখানেই। হৈ হৈ ব্যাপার।

সতেরো

মাধুরী নিজের অবস্থার সঙ্গে মানিয়েই পোশাক বদলে ফেলেছিল, ভাল শাড়ী গয়নার প্রতিযোগিতায় আর সে নামেনি। এখন সে কমলার পরিচয় পেয়ে মনে মনে ভারি খুশি হয়ে উঠল। তার চোখের সামনে একটা নতুন পৃথিবী যেন খুলে গেল। চপলার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে এই সত্যটি সে আবিষ্কার করেছিল, সে বুঝতে পেরেছিল যত ভালই পর, তার চেয়েও ভাল আছে; এই সত্যটি কমলা জীবন দিয়ে অভ্যাস করেছে, এইটে মাধুরীর কাছে ভারি ভাল লাগল।

পারুলের মনের মধ্যে সব ওলটপালট হয়ে গেছে। কমলা যে এত বড়লোক তা আগে বুঝতে পারেনি ব'লে তার কি যে লজ্জা হতে লাগল। লজ্জা হ'ল বটে কিন্তু গর্বও তার কম নয়। কমলা যে তার বন্ধু!

চপলা হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেছে। পরদিন ক্লাসে এসেছে বটে কিন্তু তাকে দেখলেই বোঝা যায় তার মনের উপর দিয়ে একটা বড় ঝড় ব'য়ে গিয়েছে।

মনে হ'ল পড়াশোনায় সে একটু বেশি মন দিয়েছে। সে পরাজিত, একটু বেশি রকম পরাজিত। সাধারণ ছেঁড়া শাড়ীব কাছে, অতি সাধাবণ এক জোড়া চুড়ির কাছে, তার সকল দামী শাড়ী আর জড়োয়া অলঙ্কার আজ হেরে গেল। ছেঁড়া শাড়ীব কাছে এই তাব প্রথম হার। এত বড় লজ্জা সে জীবনে কখনো পায়নি। পৃথিবীর চেহারা তার চোখে বদলে গেল। মাথা ঝিমঝিম করছে। উঁচু মাথাটি তার চিরদিনের জন্য নিচু হয়ে গেছে। পায়ের নিচে যেন মাটি নেই। যা ছিল তার এতদিনের বিশ্বাস, যে বিশ্বাসের উপর সে শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সে বিশ্বাস ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। এখন সে কি করবে। তার সাজ পোশাক, তার গয়না সব যেন তার সমস্ত গায়ে কাঁটার মতো খচ খচ ক'রে বিঁধছে। এ কি হল তার?

পড়ায় তার মনোযোগ নেই, বইয়ের দিকে মাথা গুঁজে মনোযোগের ভান করা মাত্র। মনোযোগ সে কেমন ক'রে দেবে? লজ্জায় ক্ষোভে দুঃখে সে আজ একেবাবে ভেঙে পড়েছে। কনকের মনও বড়ই বিষণ্ণ, ম্রিয়মাণ।

এরা যে পরিমাণ পরাজিত, মাধুবী পারুল এবং অন্যান্য সাধাবণ মেয়েরা সব সেই পরিমাণে বিজয়ী। তাদের মনের বল খুব বেড়ে গেছে। কমলাকে তারা প্রথম থেকেই মনে মনে শ্রদ্ধা করত, তার জ্ঞানের জন্য, মনের জোরের জন্য,

ব্যক্তিত্বের জন্য। এবারে কমলার কাছাকাছি আসতে আর তাদের কোনো সঙ্কোচ নেই।

কমলার কিন্তু কোনো পরিবর্তনই হয়নি। আগে যেমন এখনও তেমন। যেন কিছুই হয়নি, যেন তার বাবা কুড়ি হাজার টাকা স্কুলের জন্য দান ক'রে নিজেই ঋণ শোধ করেছেন, এই রকম ভাব।

পারুল ছুটির পরে কমলাকে পথে বলল, "কমলা, তোমাদের এত টাকা!"

কমলা হেসে উঠল। বলল, "বাবার হাতে সামান্য কিছু ছিল তা প্রায় সবটাই দিয়ে দিলেন। আমরা আর সবার মতোই গরিব। বাবা শিক্ষক ছিলেন পশ্চিম দেশের এক কলেজে। তিনি শিক্ষার জন্যই টাকাটা খরচ করবেন ভেবেছিলেন। আমি এই স্কুলে পড়ি, তাই এই স্কুলকেই দিলেন। যাই হোক, এ সব কথা আমরা কেন আলোচনা করি, ক'দিন পরে পরীক্ষা মনে আছে তো?"

"তা আর নেই?"

ওরা পড়ার কথা আলোচনা করতে করতে চলল।

স্কুলে ওদের ক্লাসের মেয়েদের মধ্যে আগে যেমন একটা পরিচিত ভাব ছিল, তা এখন কি রকম যেন হয়ে গেছে। চপলাও তার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে না, তারাও চপলার সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়ে আসে না। চপলা নিজেই ছোট হয়ে গেছে নিজের কাছে, তাই সে আর অভিমানও করে না।

শাদাসিদে একটি মেয়ে নামল গাড়ি থেকে। (পৃ. ৯৯)

দিন কাটছে একঘেয়ে।

কয়েক সপ্তাহ পরের ঘটনা। রবিবার সকাল। কমলা নিজের ঘরে পড়ছে ব'সে।

একখানা গাড়ি এসে থামল তাদেরই দরজায়। শাদাসিদে একটি মেয়ে নামল গাড়ি থেকে।

বাড়ির নম্বর দেখে দরজায় কড়া নাড়ল।

চপলা!

চপলা এসেছে কমলার কাছে!—শাদা পোশাকে শাদা হাতে!—প্রলয় ঘটল না, পৃথিবী উল্টে গেল না, ভূমিকম্প হ'ল না তবু!

কমলা খুব সমাদর ক'রে তাকে বসাল। চপলা একখানা ছাপা চিঠি তার হাতে দিয়ে তার দু'খানা হাত চেপে ধ'রে বলল, "তুমি যাবে ভাই? আমাকে ক্ষমা ক'রে, যাবে?"

চপলার চোখে জল।

তার বিয়ের চিঠিখানা কমলা প'ড়ে বলল, "এ তো খুব ভাল খবর, নিশ্চয় যাব।"

চপলার অশ্রু বাধা মানল না, সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "তোমার উপর কি যে অন্যায় করেছি ভাই, জ্ব'লেপুড়ে মরছি মনে মনে। বল, আমাকে ক্ষমা করেছ?"

কমলা বলল, "ক্ষমা কিসের, আমি তো কোনো দিন কিছু মনে করিনি, ভাই। তুমি কি অন্যায় করেছ তাও মনে পড়ে

না। আমি লোকটি কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকি, স্বার্থপর। অন্যের কথা ভাবিই না। খুব অন্যায় নয় কি? তোমার অপরাধ কিছু তো মনে নেই, মনে রাখিনি কিছু।"

"অনেক অন্যায় করেছি, ভাই। নিজের অহঙ্কার দিয়ে তোমার প্রতি অন্যায় করেছি, তুমি কত বড় তা না জেনে অন্যায় করেছি, তোমাকে বুঝতে চেষ্টা না ক'রে অন্যায় করেছি। তুমি ভাই, ক্ষমা না করলে আমি কোনো দিন শান্তি পাব না।"

"আচ্ছা আচ্ছা, আমি ভীষণ খেতে পারি, আমাকে তোমার বিয়ের দিন খুব খাওয়াবে, তা হ'লেই ক্ষমা। বুঝলে?"

চপলা কৃতজ্ঞ হয়ে চ'লে গেল।

সে ক্লাসের সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছিল। টীচারদেরও বলা হয়েছিল। বিয়ের লগ্ন ছিল সন্ধ্যাবেলা। অগ্রহায়ণের মধুর আবহাওয়া। কণ্ট্রোলের দিন। কিন্তু তবু মিষ্টান্নের ব্যবস্থা ভালই ছিল। মেয়েরা সবাই মিলে খুব জমিয়ে তুলল বিয়ের আসর।

পরদিন ক্লাসে চপলার অনুপস্থিতি সবার চোখে লাগল। একটি পরিচিত মেয়ে নেই তার আসনে, এবং আর কখনো থাকবে না—এতে ওদের মনে কিছু দুঃখ হ'ল।

এর পর থেকে ক্লাস চলতে লাগল শান্তিতে, কিন্তু স্বাদহীন ভাবে।

একটুখানি বিরোধ না থাকলে কি ভাল লাগে?